



যবনিকার অন্তরাল

• দৃষ্টিহীন •

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

জন্মাষ্টমী
১৩৭১

ছেপেছেন—
এস্‌, সি, মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
তিন টাকা

সাহিত্য-সম্রাট

শ্রদ্ধেয় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে

যবনিকার অন্তরালে

খবর আর আগুন, এ দুটো জিনিসই চাপা থাকে না। তাই পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় বহু বিতর্কের পর যেদিন জমিদারি-প্রথা লোপের আইন পাস হয়ে গেল, সেই মুহূর্তেই খবরটা ছড়িয়ে পড়লো ডালহাউসী স্কোয়ার আর এসপ্লানেডের অফিসে অফিসে।

সাধারণ কেরানীকুলও উৎফুল্ল হয়ে উঠলো এই ব্যাপারে। যাঁদের অবশ্য পঁচাত্তর বিঘের ওপর অন্য জমি বা ধানজমি ছিল, কেবল তাঁরাই খুশী হলেন না। মুখ গম্ভীর করে তাঁরা বললেন—এ ভাল হলো না। এ সরকারের অন্যায় অবিচার!

কিন্তু বেশিরভাগ লোকেরই জমি নেই, তাঁদের গেলও না কিছু, লাভও হলো না কিছু। তাঁরা কিন্তু খুশী হয়ে উঠলেন। খুশী হলেন এইজন্যে যে অফিসের অনেকেই জমি হারিয়ে তাঁদের সমান হলেন। যাঁরা এতদিন টিফিনের সময় ভাল পাটালিগুড় কৌটো থেকে বার করে, কলা আর মুড়ির সঙ্গে মাখতে মাখতে বলতেন—কি হে ভায়া, খাবে নাকি?

কলাগুলো বেশ পুরুষ্টু। চেহারা দেখে সহকর্মীরা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করতেন—কত দিয়ে কিনলেন দাদা?

হাসতে হাসতে তিনি জবাব দিতেন—হেঁ হেঁ ভাই, এ আর কি

কেনা! শনিবার দিন বাড়ি গিয়েছিলাম, আসবার সময় তোমার বউদি এগুলো দিলেন। আমার জমিতেই ফলেছে। মুড়িগুলো তাঁরই ভাজা। কয়েক বিঘে জমির ওপর গোটাকতক খেজুরগাছ আছে, তার থেকেই তিনিই লোক দিয়ে এই গুড় তৈরি করিয়েছেন। কলাটা তাঁরই ইয়েতে তৈরী হয়েছে। মানে কিনা, বাজারে এ জিনিস তুমি পাবে না। পিওর ভাইটামিন।

ভাইটামিনের তত্ত্ব কতদূর তাঁরা বুঝতেন জানি না, কিন্তু খুব খুশীও তাঁরা হতেন না এসব খবরে। তাঁদের রাগ হতো এই ভেবে যে, এই লোকগুলো বিনা পয়সায় বেশ একটা টিফিনের ব্যবস্থা করে নিয়েছে দেখে।—এতদিনে তাঁদের জমি গেল!

এইরকম একটা অফিসে টিফিনের সময় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এঁদের প্রতিপক্ষের প্রধান নেতা ছিল পুলিন। বয়েস বেশী নয়। পরনে ফুল প্যাণ্ট, গায়ে হাফ সার্ট আর পায়ে কাবলী জুতো। চুলগুলো রুক্ষ। চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক রকমের তীব্র। মুখে ওর কমনীয়তার একেবারেই অভাব। সেটা রুক্ষ চুলের জন্যেও হতে পারে বা চোখের অস্বাভাবিক দৃষ্টির জন্যেও হতে পারে।

একজন তারই সমবয়সী, বিনোদ তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে কথা বলছিল।

কথা অবশ্য বিশেষ কিছু হচ্ছিল না, সবটাই এলোমেলো। এ যেন চেঁচিয়ে গলার আওয়াজ পরীক্ষা করা।

পুলিন কথা একটু কম বলে। সে আলোচনায় যোগ দেয়নি প্রথমটায়।

লোকের ধারণা পুলিন জানে অনেক। বিনোদ এতক্ষণ চেঁচিয়ে এইটেই বোঝাতে চেষ্টা করছিল, সরকার আইনটা পাস করে খুব ভাল কাজই করেছেন।

প্রতিপক্ষ ছিলেন রাখালবাবু। প্রায় দুশো বিঘে জমি ছিল

তাঁর। ইতিমধ্যেই পঁচাত্তর বিঘে নিজের নামে, পঁচাত্তর বিঘে স্ত্রীর নামে আর পঞ্চাশ বিঘে ছেলের নামে করে নিয়েছেন। তবুও তাঁর মন খুঁতখুঁত করছিল এই ভেবে যদি স্ত্রী আর ছেলে কোনরকম ভাবে বেইমানি করে!

তাই এই তর্কে তিনি যোগদান করেছিলেন।

বিনোদ আর রাখালবাবু অনেকক্ষণ ধরেই তর্ক করছিলেন। এখন দুইজনেই ক্লান্ত, তাই পুলিনকে তাঁরা মধ্যস্থ মেনেছেন।

কিন্তু তাঁদের বিস্মিত করে দিয়ে পুলিন হঠাৎ বলে উঠলো—না, ঠিক হয়নি। সরকার ভুল করেছেন।

দুজনেই বিস্মিত হয়ে বললেন—তার মানে?

পুলিন বললো—তার মানে খুব সোজা। এখনও পুঁজিবাদীদের বাঁচিয়ে রাখা হলো।

—তার মানে?

পুলিন বললো—তার মানে খুব সোজা। তোমাদের বিধান রায়, জওহরলাল, সকলেই বড়লোকের ছেলে। তারা কখনও তাদের স্বার্থ ছাড়া দেশের লোকের ভাল করতে চায় না।

রাখালবাবু একেবারে থ। এদিকটা তো তিনি ভাবেননি। তবুও তিনি বললেন—তুমি বলছো কি পুলিন? পণ্ডিতজী স্বাধীনতার জন্যে কি কম স্বার্থত্যাগ করেছেন! বিধানবাবু নিজের বাড়িতে বসেই যথেষ্ট রোজগার করতে পারতেন। তাঁর একটা 'কলে'র 'ভিজিট' চৌবট্টি টাকা। দিনে দুটো করে কলে গেলেই আমাদের মাইনেটাই তো তিনি রোজগার করতে পারতেন। তা না করে এ সমস্ত করার অর্থ? এর মধ্যে কি কোন স্বার্থত্যাগ তুমি দেখতে পাও না?

পুলিন একটু জোর দিয়েই বলে—না, দেখতে পাই না। তার কারণ এসব কাজকর্মের মধ্যে তাঁর একটা উদ্দেশ্য আছে।

কেনা! শনিবার দিন বাড়ি গিয়েছিলাম, আসবার সময় তোমার বউদি এগুলো দিলেন। আমার জমিতেই ফলেছে। মুড়িগুলো তাঁরই ভাজা। কয়েক বিঘে জমির ওপর গোটাকতক খেজুরগাছ আছে, তার থেকেই তিনিই লোক দিয়ে এই গুড় তৈরি করিয়েছেন। কলাটা তাঁরই ইয়েতে তৈরী হয়েছে। মানে কিনা, বাজারে এ জিনিস তুমি পাবে না। পিওর ভাইটামিন।

ভাইটামিনের তত্ত্ব কতদূর তাঁরা বুঝতেন জানি না, কিন্তু খুব খুশীও তাঁরা হতেন না এসব খবরে। তাঁদের রাগ হতো এই ভেবে যে, এই লোকগুলো বিনা পয়সায় বেশ একটা টিফিনের ব্যবস্থা করে নিয়েছে দেখে।—এতদিনে তাঁদের জমি গেল!

এইরকম একটা অফিসে টিফিনের সময় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এঁদের প্রতিপক্ষের প্রধান নেতা ছিল পুলিন। বয়েস বেশী নয়। পরনে ফুল প্যাণ্ট, গায়ে হাফ সার্ট আর পায়ে কাবলী জুতো। চুলগুলো রুক্ষ। চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক রকমের তীব্র। মুখে ওর কমনীয়তার একেবারেই অভাব। সেটা রুক্ষ চুলের জন্যেও হতে পারে বা চোখের অস্বাভাবিক দৃষ্টির জন্যেও হতে পারে।

একজন তারই সমবয়সী, বিনোদ তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে কথা বলছিল।

কথা অবশ্য বিশেষ কিছু হচ্ছিল না, সবটাই এলোমেলো। এ যেন চেঁচিয়ে গলার আওয়াজ পরীক্ষা করা।

পুলিন কথা একটু কম বলে। সে আলোচনায় যোগ দেয়নি প্রথমটায়।

লোকের ধারণা পুলিন জানে অনেক। বিনোদ এতক্ষণ চেঁচিয়ে এইটেই বোঝাতে চেষ্টা করছিল, সরকার আইনটা পাস করে খুব ভাল কাজই করেছেন।

প্রতিপক্ষ ছিলেন রাখালবাবু। প্রায় দুশো বিঘে জমি ছিল

তাঁর। ইতিমধ্যেই পঁচাত্তর বিঘে নিজের নামে, পঁচাত্তর বিঘে স্ত্রীর নামে আর পঞ্চাশ বিঘে ছেলের নামে করে নিয়েছেন। তবুও তাঁর মন খুঁতখুঁত করছিল এই ভেবে যদি স্ত্রী আর ছেলে কোনরকম ভাবে বেইমানি করে!

তাই এই তর্কে তিনি যোগদান করেছিলেন।

বিনোদ আর রাখালবাবু অনেকক্ষণ ধরেই তর্ক করছিলেন। এখন দুইজনেই ক্লান্ত, তাই পুলিনকে তাঁরা মধ্যস্থ মেনেছেন।

কিন্তু তাঁদের বিস্মিত করে দিয়ে পুলিন হঠাৎ বলে উঠলো—না, ঠিক হয়নি। সরকার ভুল করেছেন।

দুজনেই বিস্মিত হয়ে বললেন—তার মানে?

পুলিন বললো—তার মানে খুব সোজা। এখনও পুঁজিবাদীদের বাঁচিয়ে রাখা হলো।

—তার মানে?

পুলিন বললো—তার মানে খুব সোজা। তোমাদের বিধান রায়, জওহরলাল, সকলেই বড়লোকের ছেলে। তারা কখনও তাদের স্বার্থ ছাড়া দেশের লোকের ভাল করতে চায় না।

রাখালবাবু একেবারে থ। এদিকটা তো তিনি ভাবেননি। তবুও তিনি বললেন—তুমি বলছো কি পুলিন? পণ্ডিতজী স্বাধীনতার জন্যে কি কম স্বার্থত্যাগ করেছেন! বিধানবাবু নিজের বাড়িতে বসেই যথেষ্ট রোজগার করতে পারতেন। তাঁর একটা 'কলে'র 'ভিজিট' চৌষট্টি টাকা। দিনে দুটো করে কলে গেলেই আমাদের মাইনেটাই তো তিনি রোজগার করতে পারতেন। তা না করে এ সমস্ত করার অর্থ? এর মধ্যে কি কোন স্বার্থত্যাগ তুমি দেখতে পাও না?

পুলিন একটু জোর দিয়েই বলে—না, দেখতে পাই না। তার কারণ এসব কাজকর্মের মধ্যে তাঁর একটা উদ্দেশ্য আছে।

বিনোদ বলে—সে উদ্দেশ্যটা কি ?

পুলিন বলে—তোমাদের মত লোক তাঁকে ঘাড়ে করে নাচবে বলে। নয়তো বুড়োবয়সে মন্ত্রিত্ব করার মানে ?

পুলিনের এ কথার জবাব সহসা কেউ দিতে পারলো না। কিন্তু মনও কারুর মেনে নিল না।

—তবু, তবু—

বলতে বলতে রাখালবাবু চুপ করলেন।

এদিকে টিফিনের সময়ও শেষ হয়ে আসছিল।

কেরানীর দল যে যার টেবিলে গিয়ে বসলেন।

অফিসের কাজ শুরু হলো। টাইপিস্ট আবার খটখট করে টাইপ করতে শুরু করলো।

কিন্তু আজ কারুরই কাজে মন নেই। সকলেই ফাইল খুলে নিজেদের ভেতর গল্পগুজবে সময় কাটালো।

পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটি হলো। মুখ হাত ধুয়ে কেরানীর দল নিশ্বাস ফেলে বললেন—আঃ, একটা দিন কাটলো !

এখান থেকে কেউ বা গেলেন বাজারে ভাল কি তরিতরকারি আছে তাই দেখতে, কেউ বা গেলেন গিন্নীর ফর্দমত জিনিস কিনতে। কেউ বা ট্রামে ভিড় হবার আগে উলটো ট্রামে চড়ে বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন।

পুলিনের এসব কিছুই নেই। বাড়ি ফেরবার তাগাদাও নেই। কারণ সে থাকে কলকাতার একটা হোটেলে।

এখান থেকে সে যাবে পার্টি-অফিসে। ভাল করে তাকে পার্টি-অফিস থেকে খবর নিতে হবে সরকারের এই আইন পাসের সময় কারা বিরোধিতা করেছিল।

তাদের নামগুলো পেলে একটা কাগজে সে লাল অক্ষরে লিখে রাখবে। তাকে দেখতে হবে দুলাল এর প্রতিবাদ করেছে কিনা।

নিজেকে প্রোগ্রেসিভ বলে সে। কিন্তু প্রোগ্রেসিভ সে নয়। পুলিন জানে ও একজন সাধারণ পুঁজিবাদী জমিদারের ছেলে। তার ওপর ওর বড় রাগ। কারণ দুলাল তার জীবনে শেল হেনেছে। দু'বছর আগে অপমান করে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তার জ্বালা আজও সে ভুলতে পারেনি।

তার জন্যেই সে ক্ষিপ্ত। কিন্তু অপমানের প্রতিশোধ আজও নেওয়া হয়নি। সুযোগও সে পায়নি।

যদি সে পারতো, দুলালের মুখোশটা সে খুলে দিত সকলের সামনে। কিন্তু—দুলাল ভাল বক্তৃতা করতে পারে। তারপর কংগ্রেসের ও একজন পাণ্ডা।

হবে নাই বা কেন! মোটা চাঁদা দিতে পারে। তার ওপর বিলেতফেরত। লেখাপড়াও জানে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়! সবটাই তো নিজের পাতে ঝোল টানবার জন্যে।

ওর দেশপ্রেম হচ্ছে লোক হাত করে নির্বাচনে জয়ী হওয়া। কংগ্রেসে মেশার অর্থ হলো ওর ব্যারিস্টারী ব্যবসায় মক্কেল পাকড়ানো।

পুলিন এসব দেশপ্রেমের কথা জানে, কিন্তু করতে পারে না কিছুই। তাই নিষ্ফল আক্রোশে মনে মনে সে ফোলে। তার শক্তিই বা কতটুকু!

পার্টি-অফিসে যখন সে পৌঁছুলো তখন অনেকেই সেখানে এসে গেছেন। কিন্তু কর্তা-ব্যক্তিরা তখনও কেউ আসেননি।

খানিকক্ষণ সে অপেক্ষা করলো। হঠাৎ এইখানেই রেণুর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

রেণুর গায়ের রং ফরসা। একটু মোটা ধরনের চেহারা। বয়স বোধ হয় তারই মত হবে। গ্রামে থাকবার সময় তার বাবা তার বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু বছরখানেকের মধ্যেই সে বিধবা

হয়েছিল। বাড়িতে বসিয়ে না রেখে মেয়েকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন।

রেণু ভালভাবেই বি. এ. পাস করেছিল। কিন্তু সেই বছরেই অগস্ট মাসে হিন্দু-মুসলমানে লাগলো দাঙ্গা।

তার বাবা ভয় পেলেন। শুধু রেণু নয়, রেণুর ছোট আরও দুটি বোনকে নিয়ে সর্বস্ব ছেড়ে, তিনি এলেন কলকাতায়।

প্রথমে উদ্বাস্তু ক্যাম্প, সরকারী ডোল। তারপর চেষ্টাচরিত্র করে রেণু একটা স্কুলে চাকরি যোগাড় করেছে। তার বাবা বৃদ্ধ, ভাইও এখন স্কুলে পড়ে। সুতরাং রেণুকেই সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল।

কলকাতার একটা ছোট বাড়ির একতলায় তারা থাকতো। মেজ বোন বেণু আই. এ. পাস করে টাইপ শিখেছিল। তাইতে তারও একটা চাকরি হয়েছে। সুতরাং সংসারে অভাব থাকলেও কোনরকমে চলে যেত।

পুলিনের মত ওরা দু'বোনও পার্টির সদস্যা। ওরাও এখানে এসেছিল আজ খবর জানতে। কিন্তু পার্টির কর্তারা ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেও কেউ এলেন না।

রেণুকে পুলিনের ভাল লাগতো। একটা অদ্ভুত প্রাণ-মাতানো আকর্ষণ-শক্তি তার ছিল। মিষ্ট কথা আর তার হাসির মধ্যে সে একটা আন্তরিকতা অনুভব করতো। এইখানেই তাদের সঙ্গে তার পরিচয়। ওরা তিনজনেই বেরিয়ে পড়ে পার্টির অফিস থেকে।

ট্রামরাস্তায় এসে রেণু বলে—পুলিনবাবু, এখন বাড়ি গিয়ে কি করবেন ?

পুলিন হেসে বলে—বাড়ি তো আমার নেই !

রেণু হেসে বলে—ও, তাও তো ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি

আবার থাকেন একটা হোটেলে। আচ্ছা, এই হোটেলে থাকায় আপনার খরচ বেশী হয় না?

পুলিন এইবার জবাবে বলে—খরচ কিছু বেশী হয় বটে, কিন্তু এতে একটা সুবিধা আছে।

রেণু ও বেণু দুজনেই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—তার মানে! এতে আপনি কি সুবিধা পেলেন?

পুলিন বলে—কোন একটা বিশেষ ছোট্ট জায়গায় নিজেকে আবদ্ধ করি না। সারা পৃথিবী আমার ঘর। কোন একটা বিশেষ জায়গাকে নিজের জায়গা বলব না।

রেণু হেসে বলে—তা মন্দ নয়। তা এভাবে কতদিন চলবে? একটা বিয়ে-থা করুন। সংসার করবেন না?

পুলিন বলে—সংসার? সে তো আমার জন্যে নয়! আমার চাল নেই, চুলো নেই। সম্বলের মধ্যে এই চাকরি। আমাকে দেখে কে মেয়ে দেবে বলুন?

বেণু বলে—কতদিন আর এভাবে চলবে?

রেণু বলে—বাঙলাদেশে মেয়ের বাবা আঁস্তাকুড়েও মেয়ে ছড়াতে বাদ দেয় না। আপনি কি আঁস্তাকুড়ের চেয়েও অধম?

পুলিন বলে—বোধ হয় তাই।

বেণু বলে—না না, আপনি আঁস্তাকুড় কেন হবেন? আপনি হচ্ছেন দালান-কোঠার কোণ। যেখানে মেয়ে দিয়ে বাবারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

রেণু বলে—যাক ও-সমস্ত বাজে কথা। আপনার হোটেলের ঘরের নম্বরটা কত বলুন তো? কাল আমার স্কুলের ছুটি আছে, ভাবছি ছাত্রী পড়িয়ে সাড়ে সাতটার সময়ে আপনার ওখানে যাব। একটু কথা ছিল।

পুলিন বলে—কি কথা বলুন তো?

রেণু বলে—দেখুন, বছর দেড়েক আগে পার্টির মেম্বার হয়েছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাজের কোন ভার পাইনি। সেই সম্বন্ধেই কথা। আর একটা ব্যাপার। আপনার সঙ্গে একটু মেশবার সুযোগ···। থেমে গিয়ে সে আবার বলে—আর আপনার সঙ্গে তো প্রহ্লাদদার আলাপ আছে, তাঁকে বলে যদি একটা কাজের ব্যবস্থা করতেন। তাহলে—

পুলিন বলে– রাত্তির সাড়ে আটটা বেজে গেল। বেশ, কাল আসবেন, সব কথা হবে। আমি এখন ফিরি? যেতে হবে শেয়ালদার কাছে।

রেণু বলে—আপনার ঘরের নম্বরটা কত?

পুলিন বলে—দোতলায়, সতেরো নম্বর ঘর। নীচে দরোয়ানকে বললেই আপনাকে দেখিয়ে দেবে।

পুলিন আর দাঁড়ায় না। নমস্কার করে সেখান থেকে চলে আসে। দুলালের কোন খবর পাওয়া গেল না বলে তার মনটা বিজাতীয় আক্রোশে ভরে গেল তখন।

প্রায় স'নটার সময় এসে পুলিন নিজের ঘরের তালা খুলে ঢুকলো। কিন্তু ঘরের দরজা খুলতেই কি একটা জিনিস তার পায়ে লেগে এগিয়ে গেল।

আলো জ্বেলে পুলিন দেখলো সেটা আর কিছুই নয়, একটা লাল খাম।

হোটেলের পুরনো বন্ধুদের কারুর বিয়ে মনে করে সেটাকে সে টেবিলের ওপর তুলে রাখলো।

ঘরে আসবাবপত্র বলতে আছে একটা টেবিল আর একটা ছোট খাট। আর দেওয়ালে টাঙানো আছে একটা আলনা।

প্যাণ্ট, শার্ট আলনায় টাঙিয়ে রেখে সে একখানা ধুতি পরলো। তারপর স্নানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল।

আরও তিন কোয়ার্টার বাদে স্নান খাওয়া সেরে সে এসে ঢুকলো ঘরে। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে গিয়ে বসলো টেবিলের কাছে।

টেবিলের ওপরে একটা ফটো ফ্রেমে রয়েছে স্ট্যালিন আর কার্ল মার্ক্সের ফটো। তার বিশ্বাস কার্ল মার্ক্সের সুযোগ্য শিষ্য স্ট্যালিন। টেবিলের ওপর রয়েছে খানকতক U. S. S. R. পত্রিকা এবং 'চাইনিজ পিপল্‌স্ নিউজ', একটা 'ডাস ক্যাপিটাল' আর একখানা 'Reply to Spiritualism' এবং আরও খানকতক ওই জাতীয় বই।

কিন্তু আজকে প্রথমেই তার দৃষ্টি পড়লো সেই লাল খামটার ওপর। কার বিয়ে? জানবার জন্যে তার মনে কৌতূহল হলো।

খামটা সে টেনে খুলে ফেললো। তার থেকে বেরিয়ে এলো বিয়ের ছাপা নেমন্তন্ন পত্র আর হাতে-লেখা একখানা পত্র। চিঠিটায় লেখা রয়েছেঃ ভাই পুলিন, আগামী ১১ই তারিখে শর্মিলার বিয়ে হচ্ছে। অনেক কষ্টে তোমার ঠিকানা যোগাড় করেছি। সন্ধ্যের পর এসেছিলাম, শুনলাম তুমি রাত নটার আগে নাকি ফের না। একবার বিয়ের দিন এসো। না এলে কত্তা বড় দুঃখ পাবেন। তাঁর বড় ইচ্ছে শর্মিলার বিয়েতে তুমি উপস্থিত থাকো। খোকাবাবু এখন আইনসভা নিয়ে ব্যস্ত। তাই আমার ওপর এই আদেশ। তুমি যদি না আসো, কত্তা ভাববেন আমি তোমায় নিমন্ত্রণ করিনি। সুতরাং আমার চাকরি বাঁচাবার জন্যও একবার এসো। ইতি—

তোমারই

জটিদা

চিঠিখানা পড়ে তার ভুরু কুঁচকে উঠলো। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে ধরে সে দাঁত দিয়ে চাপতে লাগলো। এই সেই দুলালদার বোন শর্মিলার বিয়ে।

পুলিনের মনে হলো কে যেন তাকে চাবুক মেরেছে। তার জ্বালা সে সারা শরীর দিয়ে অনুভব করতে লাগলো।

কী করবে সে? জটিদা! ওদের মত ওই গোটাকতক পা-চাটা কুকুর আছে বলেই ওরা মনে করে সারা পৃথিবীটাকে বুঝি পায়ে দলবার অধিকার ওদের আছে।

তাছাড়া ওই বৃদ্ধ শতদলবাবু, ওর ওটা করুণা? না, সত্যি স্নেহ? কে বলবে? অদ্ভুত মানুষের মন। একদিন ওই শতদলবাবুকেই পরম আত্মীয়জ্ঞানে আশ্রয় করে সংসার-নদীতে পুলিন ভেসেছিল।

কিন্তু আজ? শতদলবাবু শুধু তার শত্রু নয়, তার মত শত শত পুলিনের বাড়ি-ঘরদোর কেড়ে নিয়ে ওই শতদলবাবু নিজের জন্যে সঞ্চিত করছে। জমিয়ে রাখছে ওই দুলাল আর সুলালের জন্যে। সুলাল আর সে তো একই বয়সী।

সুলালকে খাটতে হলো না জীবনে। তার মত নটায় ভাত মুখে গুঁজে পরের গোলামি করতে যেতে হয় না ট্রামে ঝুলে। সে মোটরগাড়ি ছাড়া চলে না।

তার চেয়ে লেখাপড়ায় অনেক নিকৃষ্ট হয়েও সে আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। বড় ব্যবসাদার।

আর শর্মিলা? কি বোকা ছিল সে! একসময় সে মনে করেছিল শর্মিলা তাকে ভালবাসে।

তার চোখের দৃষ্টি আরও তীব্র হয়ে উঠলো। রাগে তার ভুরু যেন আরও কুঁচকে গেল। হয়তো সে যেদিন অপমানিত হয়ে ওই বাড়ি থেকে জন্মের মত বেরিয়ে এসেছিল, সেদিন সে মুখ টিপে হেসেছিল।

মনে মনে ভেবেছিল, কেমন, কেমন হয়েছে! আর চাইবে বামন হয়ে আকাশের চাঁদে হাত দিতে?

হয়তো তার ব্যথাতুর মুখখানা দেখে সে একটা তৃপ্তি অনুভব করেছিল। নইলে এ দু'বছর পর তাকে মনে করে খবর নেবার প্রয়োজন?

পুলিন ওদের জমিদারির নায়েবের ছেলে বই তো নয়!

নিজের মনেই কার্ডখানা বার করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে রাগে ফুলতে ফুলতে পুলিন বলে—'I hate you, I hate all of you!'

কিন্তু ছিড়ে ফেলেই তার মনে হলো, এতে তো প্রতিশোধ নেওয়া হলো না। বিয়ের নেমন্তন্ন যদি সে না রাখে, তাহলে ওরা মনে করবে কিছু দেবার ভয়ে সে বুঝি যায়নি। সে খাক বা না-খাক তাকে যেতে হবে। আর গিয়ে এমন একটা কিছু প্রেজেণ্টেশন দেবে, যাতে ওদের মাথা অবধি ঘুরে যায়। ওরা ভাববে, হ্যাঁ পুলিনের ক্ষমতা আছে বটে।

শুধু তাই নয়, তার খাতিরও বেড়ে যাবে। নায়েবের ছেলের অপমান, তাতেই শোধ নেওয়া হলো। কুচো কাগজগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে দিতে, এই ধরনের এলোমেলো চিন্তা করতে করতে সে এলো বিছানায়। তারপর উত্তপ্ত মস্তিষ্কে এপাশওপাশ করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা সে নিজেই জানতে পারেনি।

*

আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে পুলিনের জন্ম হয়েছিল বাঙলাদেশের কোন এক গ্রামে। তখন ইংরেজ আমল। শাঁখ বাজিয়ে নবজাত শিশুকে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু পরমুহূর্তেই বাড়িতে উঠেছিল কান্নার রোল! অবশ্য কাঁদছিল তার বিধবা এক পিসী আর গ্রামের প্রতিবেশিনীর দল। সকলেই বলেছিল—"আহা! বউটি বড় ভাল ছিল।" এই সহানুভূতির আর একটা অর্থ ছিল। পুলিনের বাবা পরেশের সঙ্গে গ্রামের এক বিধবা কৈবর্তের মেয়ে পুতুলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। লোকে সেইটেকে ইঙ্গিত করেই "বউটি ভাল ছিল" এই কথাটা বলেছিল কিনা, তা ঠিক জানা নেই। পরেশের সঙ্গে তার সম্বন্ধ পুলিনের মা লক্ষ্মীকে বিয়ে করবার আগে থেকেই। পুতুল বিধবা হয়ে যখন গ্রামে ফিরেছিল, তখন তার বয়স তেরো-চোদ্দর বেশী নয়। পুলিনের বাবার বয়সও সেইরকমই। সবে ফিফ্‌থ্‌ ক্লাস থেকে ফোর্থ ক্লাসে প্রমোশন পেয়েছে। অর্থাৎ আজকের দিনের ক্লাস সিক্‌স্‌ থেকে সেভেনে।

কিশোর বয়সের সীমান্তে দুজনেই। যৌবনের আগমনীর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

স্বামিসঙ্গ করার ফলে কিশোরী পুতুল তখন পুরুষ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

আর পরেশ? নারীর দেহের প্রতিটি রেখায় রেখায় তার চোখে তখন জাগে বিস্ময়।

গরিবের ঘরের মেয়ে হলেও পুতুল নিয়ে জন্মেছিল অটুট স্বাস্থ্য। কালো রং হলে হবে কি, তার দেহের মধ্যে ছিল একটা আলগা

চটক। তার ওপর ছিল কালো কালো টানা চোখ। পিঠ ভরতি চুল।

ঘাট থেকে একদিন স্নান করে ভিজে কাপড়ে পুতুল বাড়ি যাচ্ছিল। গ্রামের মাঠে ক্রিকেট খেলায় রত পরেশের চোখে সে এমনি অবস্থায় পড়ে যায়।

চার বছর পরে পরেশ তাকে দেখে হলো বিস্মিত। এ যেন সে পুতুল নয়। অবাক্ হয়ে পরেশ তাকে দেখতে লাগলো।

ভিজে কাপড়ের মধ্যে থেকে তার দেহের নগ্নসৌন্দর্য যেন ফেটে বেরুচ্ছিল! ব্যাপারটা পুতুলের চোখে পড়তে পরেশকে আকর্ষণ করতেই হোক বা নারীর মোহিনীজাল বিস্তার করতেই হোক সে একবার ফিক্ করে হেসেই ছুটে পালিয়ে গেল সে জায়গাটা থেকে।

ব্যস্! কিশোর পরেশ সেইদিন থেকেই পাগল হলো পুতুলের জন্যে। স্কুল পালিয়ে সে রোজই পুকুরঘাটে আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াতো।

এইভাবেই কেটে গেল আরও একটা বছর।

ব্যাপারটা প্রথমে লোকে ততখানি বড় করে দেখেনি। কিন্তু বড় করে দেখলো তখন যখন পরেশ বাৎসরিক পরীক্ষায় একেবারে দাঁড়িয়ে ফেল করলো।

পরেশকে মানুষ করছিল পরেশের এক সতাতো বোন—ক্ষান্তমণি। পরেশের বাবা মণীন্দ্র ক্ষান্তমণির জন্মের পর ঝগড়াটে স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করতে না পেরে নাকি সংসার ত্যাগ করেছিল। সংসার অসার মনে করে সে এক সন্ন্যাসীর চেলা হয়েছিল।

জমিজমা কিছু ছিল। তাইতেই ক্ষান্ত আর তার মায়ের চলে যেত। যে বছর অজন্মা হতো সে বছর ক্ষান্তর মা কিছু কিছু জমি বিক্রি করতো। অবশেষে একদিন ক্ষান্তর মা যক্ষ্মারোগে

আক্রান্ত হলো। উপযুক্ত চিকিৎসা এবং দেখাশোনা করার অভাবে একসময় তার দিনও ফুরালো।

তখন ক্ষান্তর বয়সই বা কত! আট-নয়ের বেশী নয়।

ওদিকে মণীন্দ্র বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রথমে আসে কলকাতায়। কলকাতায় এসে সে যায় মায়ের স্থানে অর্থাৎ কালীঘাটে।

সেদিন বোধহয় কিছু একটা যোগের সময় হবে, কারণ বহু সন্ন্যাসী এসে জমা হয়েছিল মায়ের মন্দিরে।

মন্দিরে ভিড় প্রচণ্ড। সে মন্দিরে না ঢুকে নাটমন্দিরে এদিক-ওদিক করতে লাগলো।

ঠিক এমনি সময় তার চোখে পড়ে গেল এক ছ' ফুটের ওপর দীর্ঘ সন্ন্যাসী। গায়ের রং ফরসা। মুখ গোঁফ-দাড়িতে ভরে গেছে। সারা শরীরে ছাই মাখা। মাথায় জটা।

তিনি কাকে যেন উদ্দেশ করে বলছেন—আরে বাবা, সংসারমে রয়নেসে এইসি হালত হোতা হ্যায়। সারা জীবন রোনেকো যাতা হ্যায়। উস্‌মে শান্তি নেহি হ্যায় বাবা! শান্তি হ্যায় ঈশ্বরকা ধ্যানমে।

যাকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছিল সেই ভদ্রমহিলার বয়েস তিরিশ বছরের বেশী নয়। গায়ে এক-গা গহনা, সঙ্গে দাসী। দেখলেই বোঝা যায় কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের বউ হবে।

ভদ্রমহিলা সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসে পড়লেন। গলায় আঁচল দিয়ে মাথা নীচু করে সন্ন্যাসীর পায়ে হাত দিলেন।

কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন—বাবা, একটা ব্যবস্থা তোমায় করতেই হবে। আমি জানি বাবা, ইচ্ছে করলে তুমি সব পার।

সন্ন্যাসী বললেন—নেহি মা, নেহি মা, যো কুছ সেকতা হ্যায়, ওই মন্দিরমে কালীমাঈ হ্যায়! হাম কৌন হ্যায়! হাম তো হ্যায় মাতাজী কো দাস। উন্‌হি কো জানাও!

ভদ্রমহিলা বললেন—উনি তো কথাও বলেন না, সাড়াও দেন না। আমি তোমাকে পেয়েছি। সুতরাং তোমাকে ধরেছি। আমি আর কাউকে জানি না। আমার একটা ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে বাবা। নইলে আমি যে পথে বসে যাব! তার চেয়ে বরং তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরা ভাল। তুমি একটা কিছু ব্যবস্থা—

এইবার ভদ্রমহিলা সত্যি মাথা নীচু করলেন সন্ন্যাসীর পায়ে ঠোকবার জন্যে।

সন্ন্যাসী বললেন—নেহি মাঈজী, এইসি করনেসে নেহি হোগা। আচ্ছা যাও! রাতমে দেখেগা, কালী মাঈকি কেয়া আদেশ হোতা। মাঈজীকো আদেশ হোনেসে তো কুছ ভাবনাই নেহি!

ভদ্রমহিলা এবার উঠলেন। আঁচল থেকে পাঁচখানা দশ টাকার নোট সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে প্রণামী রেখে বললেন—একটা ব্যবস্থা তোমায় করে দিতেই হবে বাবা, মায়ের আদেশ আনতেই হবে যে করে হোক।

মণীন্দ্রের মনে হলো, ইনি বুঝি জ্যান্ত ভগবান। সংসার যখন হলোই না, তখন দেখা যাক, এঁর আশ্রয়ে থেকে মোক্ষের সন্ধান পাওয়া যায় কি না।

এবারে সে এগুলো। সন্ন্যাসী তখন টাকাটা তুলে নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজছেন, তাই তার ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়েনি। সে সোজা গিয়ে টিপ করে তাঁকে একটা প্রণাম করলো।

সন্ন্যাসী বললেন—তুম্ কৌন্ হ্যায় বেটা?

মণীন্দ্র বলে—তোমার দাস বাবা। একবার যখন দেখা পেয়েছি তখন আর তো ও চরণ ছাড়বো না!

সন্ন্যাসী প্রথমে কি যেন ভাবেন, তারপর বলেন—ঠিক হ্যায়, বইঠ যাও।

কথা বলবার সময় ছিল না। কারণ তখন গঙ্গাস্নান করে তসর বা গরদের কাপড় পরে বহু মেয়ে আসছে মন্দিরে পুজো দিতে। সন্ন্যাসীদের প্রতি তাদের ভক্তির শেষ নেই। ওই একই ইতিহাস ! কারোর স্বামী বশ হচ্ছে না, তাই তার একটা বশীকরণ মাদুলি চাই। কারোর বা মেয়ে কালো। পাত্রপক্ষ মুখ ফেরাচ্ছে। তাই তার জন্য চাই জড়িবুটি। কারোর ছেলের পাসের জন্যে মাদুলি। কারোর বা জামাই বশ। কারো চাই সতীনের দর্প খর্ব। এমনি আরও কত কি ! তবে সে লক্ষ্য করে যে, বশীকরণের মাদুলির চাহিদাই যেন সবচেয়ে বেশী। এসব দেখে তার তো তাক্ লাগবার যোগাড়। সে মনে মনে ভাবে ঠিক জায়গায়ই এসে পড়েছে। মোক্ষ তো হাতের মুঠোয় !

সকলকেই কিন্তু বাবা সেই একই উত্তর দিচ্ছেন, কালী মাঈজীকে জানাব, দেখি তোমার বরাতে কি আছে !

চাহিদা আর অবস্থা অনুপাতে প্রণামী পড়ছে এক টাকা থেকে একশো টাকা অবধি।

সন্ধ্যারতি হবার পর বাবা মন্দির থেকে গা তুললেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সে-ও উঠলো। গঙ্গাস্নান সেরে তারা গেল কাছেরই একটা ধর্মশালায়। একটা লোটায় প্রায় আড়াই সের দুধ একজন গয়লা দিয়ে গেল। সে সন্ন্যাসীর আদেশে পয়সা নিয়ে আটা আর তরিতরকারি কিনে আনলো। তারপর সাধুবাবা নিজের হাতে রুটি আর তরকারি তৈরি করলেন। তারপর তিনি সেই দুধ, রুটি আর তরকারি খাবার পর মণীন্দ্র প্রসাদ পেল। খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের ঝুলি থেকে বার করলেন ছোট্ট একটি কলকে। ওই ঝুলি থেকেই আবার বেরুলো কিছু গাঁজা আর দিয়াশলাই। তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে প্রাণভরে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন—ব্যোম্ শংকর ! টানের পর টান চললো তখন। চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করলো।

অবশেষে তিনি ক্ষান্ত দিলেন। তারপরে সেটা মণীন্দ্রের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন—লে বেটা লে! পরসাদ হ্যায়।

মণীন্দ্র এতক্ষণ সন্ন্যাসীর পদযুগল টিপে দিচ্ছিলো। হঠাৎ এই আহ্বানে সে সচকিত হয়ে উঠলো। গ্রামের ছেলে সে। ছেলেবয়স থেকেই বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসে তামাক খাওয়ার অভ্যেস সে করেছিল। দু'একবার ধান্যেশ্বরীও যে সে খায়নি তা নয়, কিন্তু এই বড়তামাক অবধি পৌঁছুতে পারেনি। কিন্তু "না"ও বলা যায় না। একে গুরুর আদেশ তার ওপর প্রসাদ!

তাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে সাধুবাবা বললেন—পিও বেটা! নেই পিনেসে মহাদেওকা মহিমা ক্যায়সে মালুম হোগা!

ব্যস্! যেটুকু বাধা ছিল তাও ঘুচে গেল। সাক্ষাৎ মহাদেবের মহিমা বুঝতে পারা যাবে এতে! তবে আর বাধা কোথায়?

মণীন্দ্র কলকেটা হাতের তেলোয় ধরে সজোরে একটা টান দিল তাতে। উচ্চারণ করতে গেল 'ব্যোম্ শংকর', কিন্তু দারুণ কাশির দমকে আর কিছুই বলা হলো না তার। সারা পৃথিবীটাই তখন দুলতে আরম্ভ করেছে তার কাছে। তখন তার মনে হলো, কে তার বাবা, কে তার মা, সেই বা কে? সব অন্ধকার হয়ে আসছে—শিবত্বের প্রথম সোপানে সে দীক্ষা পেলো সেদিন।

* * * *

পরের দিন ঘুম ভাঙলো তার সন্ন্যাসীর ডাকে। মাথাটা কি রকম ভার ভার—শরীরটাও ম্যাজম্যাজ করছে। কিছুই যেন সে বুঝতে পারছে না! সামনে সন্ন্যাসীর দিকে সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো শুধু।

সন্ন্যাসী তার ঐ অবস্থা দেখে বললেন—পহেলে স্নান কর লেও। উস্‌কো বাদ কুছ্ খাও, সব ঠিক হো যায়গা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্নান করে কিছু খেতেই তার শরীরটা খানিক

সুস্থ হলো। সন্ন্যাসী তখন তাকে প্রশ্ন করলেন, সংসারে তার কে কে আছে?

ইতিবৃত্তান্ত সব শুনে শেষে বললেন—হুঁ, এইসি হাল হোতা হ্যায়। লেকিন রূপেয়া কুছ হ্যায়?

—নেহি বাবা, রূপেয়া তো কুছ আনিনি।

—ঠিক হ্যায়, র' যাও, দীক্ষা লেও।

সেইদিনই তার দীক্ষা হলো। আর সেদিন থেকেই সে গুরুর সেবায় মন দিল।

মানুষের মন বড় বিচিত্র। ঝগড়া করে সে ভেবেছিল বুঝি সংসারের মায়া কেটেছে। কিন্তু মাস দুয়েক না যেতেই গ্রামের জন্য আবার তার মন কেমন করতে লাগলো। একদিকে গুরু, অপর দিকে তার গ্রাম। কিন্তু গ্রামের আকর্ষণ যখনই আসে তার মনে, তখনই সব কিছু ছাপিয়ে তার মনে জাগে মুখরা স্ত্রীর জন্য ভয়। সেইজন্যই সে গ্রামে ফিরতেও পারে না। এদিকে রোজগারও মন্দ হচ্ছে না। সাধুবাবার চেলা বলে ভক্তরাও দু' এক টাকা তাকে দিত। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা, অন্যদিকে দ্বারকা থেকে সাগরদ্বীপ সে ঘুরে বেড়ালো গুরুর সঙ্গে। এ জীবন তার এখন সয়ে এসেছে, তবে নিজের গ্রামকে সে ভুলতে পারেনি। ছোট কাঁটার মত মনের মধ্যে গেঁথে থেকে কেমন যেন খচখচ করে।

গুরুর দেহান্তর ঘটেছে, তাতে কি? সে এখন নিজেই সন্ন্যাসী। লোকের কাছ থেকে টাকা কি করে নিতে হয় তা শিখেছে ভাল-ভাবেই। ভিক্ষা চাইলেই এদেশে পাওয়া যায়—খাওয়ার অভাব হয় না। প্রণামীর টাকায় তার খরচ চলে এবং যথেষ্ট উদ্বৃত্ত হয়। ভগবান দূরে থাকুন। অর্থ এলেই কামিনীর সঙ্গ ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ বেশে সেটা পেতে গেলে মার খাবার সম্ভাবনা আছে। তাই মন উসখুস করলেও সে চুপ করে থাকে। এমনি অবস্থায়

যখন তার দিন কাটছিল, তখন একদিন হরিদ্বারের গঙ্গার 'হর কি পেয়ারী' ঘাটে তার দেখা হয়ে গেল গ্রামের হরিকাকার সঙ্গে। হরিকাকা তাদেরই স্বজাতি। তারই মুখে সে খবর পেল যে, তার মেয়ে ক্ষান্তমণি তখন ন' বছরে পা দিয়েছে। তার স্ত্রী মারা গেছে। ক্ষান্ত আজ অনাথা। হরিকাকারই আশ্রয়ে সে মানুষ হচ্ছে। তার আজও বিয়ে হয়নি।

হরিকাকা কিছুতেই ছাড়লেন না। তার গেরুয়া ছাড়ালেন, মাথার জটা কাটালেন, মুখের দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে গঙ্গাস্নান করিয়ে গায়ের ছাই ধোয়ালেন। নতুন কাপড়-জামা পরিয়ে আবার তাকে ফিরিয়ে আনলেন সমাজে। সেই রাতেই তাঁরা যাত্রা করলেন বাংলাদেশের অভিমুখে।

পরেশের বাবা মণীন্দ্রকে গ্রামে ফিরতে দেখে অনেকেই খুশী হলো। ক্ষান্ত হরিকাকার বাড়ি থেকে ছুটি পেয়ে বাপের হাত ধরে চলে এলো নিজের বাড়িতে। কিন্তু এতটুকু মেয়েকে নিয়ে তো সংসার পাতা যায় না! ঘরকন্নাই বা কে দেখে আর জমিজমাই বা কে দেখে? আর শিশু ক্ষান্তর তত্ত্বাবধানই বা কে করে?

এসব ব্যাপারে গ্রামে উৎসাহী লোকের অভাব হয় না। ঘর গড়তে বা ভাঙতে—এই দুয়েতেই আমরা সমান পটু। কারণ, এতে বোধ হয়, মানুষ উত্তেজনাই বোধ করে। পরোপকারের ভেক ধরে মানুষ ঐটুকু বৈচিত্র্য খুঁজে নেয় জীবনে। তাই ক্ষান্তর মা মুখরা বলে অহোরাত্র মণীন্দ্রের কাছে যারা অভিযোগ জানাতো, তারাই আবার কোমর বেঁধে লাগলো তার বিয়ে দিতে। এ ব্যাপারেও মাতব্বর হলেন হরিকাকা। গ্রামান্তর থেকে তিনি খুঁজে বার করলেন এক বিধবার ষোল-সতের বছরের মেয়ে হৈমকে। শুভদিন দেখে সকলকার উপস্থিতিতে মণীন্দ্রের একদিন বিয়ে হয়ে গেল হৈমর সঙ্গে। সংসারের হাল যুবতী হৈম ভালভাবেই ধরেছিল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মণীন্দ্র তখন নায়েবের চাকরি নিয়েছিল ঐ শতদলবাবুর বাবা অর্ধেন্দুবাবুর কাছে। জমিজমার তদারকিতে হয়তো চলে যেত, কিন্তু দীর্ঘদিন লোক ঠকিয়ে অর্থের ওপর একটা লোভ এসে গেছে তখন তার। বড় দিলখোলা লোক ছিলেন ঐ অর্ধেন্দুবাবু। মদ খেতেন। সন্ধ্যার পর বাঈনাচও হতো। কিন্তু এসব উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও যাকে যা তিনি কথা দিতেন, তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। বলতেন, "হাতিকা দাঁত, মরদকা বাত। আরে! যাকে যা কথা দেব, চন্দ্র সূর্য এক হয়ে গেলেও তার নড়চড় হবে না।"

একদিন সন্ধ্যার সময়ে কিছু তরল পদার্থ পান করে তিনি বেরিয়েছিলেন গ্রামেতেই সান্ধ্যভ্রমণে। মণীন্দ্রের বাড়ির কাছে আসতেই হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ে গেল কিশোরী ক্ষান্ত। বছরখানেক আগে ঐ বয়সীই তাঁর একটি মেয়ে মারা গিয়েছিল। হঠাৎ সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোতে তাকে দেখে মনে পড়ে গেল তাঁর সেই মৃতা মেয়েকে। পালকি চেপে যেতে যেতে বেহারাদের হুকুম করলেন—"এই উল্লুক সব, খাড়া করো!" বলা বাহুল্য যে, উল্লুকের দল ভয় পেয়ে গিয়ে তখনই পথের ধারে পালকি নামিয়েছিল। কারণ, সাধারণতঃ এমনটি ঘটে না।

হুকুম হলো—ওকে ডাক!

কাকে ডাকবে? কিন্তু জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না।

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। অর্ধেন্দুবাবুকে, স্বভাব আর খামখেয়ালের জন্যে গ্রামের লোকে বলতো রাজাবাবু। যদিও তিনি সরকারী মহল থেকে রাজা খেতাব কোনদিনই পাননি।

একজন প্রাণের মায়া ছেড়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো—কাকে ডাকবো হুজুর?

অর্ধেন্দুবাবু বললেন—ঐ মেয়েটাকে।

ব্যস, কাঁপতে কাঁপতে ক্ষান্ত এলো কাছে। ভেবেছিল, রাজা যখন, কোমরের তলোয়ারটা দিয়ে হয়তো খপ্‌ করে কেটেই ফেলবেন। কিন্তু তেমনটি কিছু হলো না।

অর্ধেন্দুবাবু তার নাম পরিচয় জেনে তাকে ছুটি দিলেন।

রাত্তিরে বাড়ি ফিরে মণীন্দ্র যখন একথা শুনলো মেয়ের মুখ থেকে, তখন তার আর ভয়ের শেষ রইলো না।

অবুঝ মেয়ে, কি বলতে কি বলেছে হয়তো চাকরিই যাবে তার।

পরের দিন কাঁপতে কাঁপতে দুর্গানাম জপ করে সেরেস্তায় গেল মণীন্দ্র। সেখানে গিয়েই শুনলো বিপদের ওপর বিপদ, রাজা বাহাদুর তাকে ডাকছেন।

আরও ভয় পেল সে। ঘাড়ে তার কটা মাথা, তাই না গিয়েও পারলো না।

কিন্তু সে যা ভেবেছিল তেমনটি ঘটলো না।

তাঁর কাছে যেতেই অর্ধেন্দুবাবু বললেন—আরে, এই যে মণীন্দ্র! তোমার মেয়ের বিয়ে দাওনি কেন?

যাঃ বাব্বা! সে যা ভেবে এসেছিল, এ তো সে ধরনের প্রশ্ন নয়!

কি জবাব দেবে এখন সে?

তাই শুকনো গলায় সে জবাব দিল—হুজুর! মানে, ইয়ে হয়েছে। আমি কাজ করি, অনেকদিন সন্ন্যাসীও হয়েছিলাম, হাতে টাকাকড়িও তেমন কিছু ছিল না, তাই মেয়ের বিয়েরও চেষ্টা করতে পারিনি।

হুকুম হলো, কাজ তোমাকে করতে হবে না। ঘুরে বেড়াও—পাত্র খোঁজ, শিক্ষিত ছেলে চাই। স্বাস্থ্য ভাল। টাকার জন্যে ভাবতে হবে না।

মেয়ের ভাগ্য দেখে মণীন্দ্র তো থ'। বাইরে এসে সে মনে মনে ভাবতে লাগলো—এ অঘটন ঘটলো কার ভাগ্যে? মেয়ে ক্ষান্তর ভাগ্যে না তার নবপরিণীতা স্ত্রী হৈমর ভাগ্যে?

যাক, যারই ভাগ্যে ঘটুক, ঘটনাটা ঘটলো। আর মণীন্দ্রও তার সব কাজ ছেড়ে দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো পাত্রের সন্ধানে।

পাত্র পাওয়া গেল। দশ মাইল দূরের গ্রামের, ভূষণকে। ভূষণের বংশমর্যাদা আছে। কলকাতায় স্কুলের হোস্টেলে থেকে সে লেখাপড়া করে। মা নেই, বাপ বর্ত্তমান।

কিন্তু কথা হলো, ভূষণের পাস করতে তখনও তিন ক্লাস বাকি। ভূষণের বাপ মহেন্দ্রবাবু ছেলের বিয়ের জন্যে বেশ মোটা টাকাই হেঁকে বসলেন। অবস্থা ভাল। বাড়িতে খাবারেরও অভাব নেই। তিন বছর পর ছেলেও মানুষ হয়ে উঠবে। আপত্তি করবার কিছু নেই।

তাই মণীন্দ্র সব কথা জানালো অর্ধেন্দুবাবুকে।

বিয়ের খরচের টাকা হিসেব করে অর্ধেন্দুবাবু তুলে দিলেন তার হাতে।

শুভদিনে ক্ষান্তর সঙ্গে ভূষণের বিয়ে হয়ে গেল। তারপর তিন বছর স্বামীর সঙ্গে ক্ষান্তর আর কোন সম্বন্ধই রইলো না।

একটা পাস দিয়ে ভূষণ সওদাগরী অফিসে একটা চাকরিও পেয়েছিল। কলকাতাতেই সে থাকতো, স্ত্রীকে নিয়ে যাবে বলেছিল। কিন্তু তার আগেই কলকাতা থেকে খবর এলো, গেরণের চানে গঙ্গার ধারে ভলান্টিয়ার হয়েছিল ভূষণ, আর সেই সময় একটি মেয়েকে জল থেকে বাঁচাতে গিয়ে সে জলে ডুবে গেছে।

ক্ষান্ত বিধবা হলো। বাপের সংসার ছেড়ে মাত্র সাত দিনের জন্যে সে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল। তারপর থেকেই সে বাপের বাড়িতেই রইলো। কেবল সিঁদুর পরলো আর মুছলো।

যাক সে কথা। এর কিছু পরেই জন্ম হয়েছিল পুলিনের বাবা পরেশের। তখন ক্ষান্ত পনেরো-ষোল বছরের মেয়ে। পরেশকে সে নিজের বুকে চেপে ধরেছিল পুত্রস্নেহে।

আরও সাত বছর পর, গ্রামেতে গ্রীষ্মকালে শুরু হয় কলেরা। তাইতেই ত্ন'দিনের ব্যবধানে হৈম আর মণীন্দ্র মারা যায়।

মরবার সময় হৈম ক্ষান্তর হাত ধরে বলে গিয়েছিল পরেশকে মানুষ করে সংসারী করে দিতে। সৎমায়ের কথা ক্ষান্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। তাই পুতুল আর পরেশের ব্যাপারটা ক্ষান্তর কানে আসতেই পনেরো-ষোল বছরের ছেলে পরেশের বিয়ের উদ্যোগ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে।

খোঁজাখুঁজি চললো। অনেক খুঁজে এই লক্ষ্মীর সঙ্গে ক্ষান্ত পরেশের বিয়ে দিয়েছিল।

লক্ষ্মী ছিল নামেও লক্ষ্মী, কাজেও লক্ষ্মী। শান্তস্বভাব এই মেয়েটিকে গ্রামের লোকে ভালবাসলেও পরেশ তার কাছ থেকে কোন আকর্ষণ বোধ করতো না। তার চেয়ে ঢের বেশী সে আকর্ষণ বোধ করেছিল ঐ পুতুলের মধ্যে।

ইতিমধ্যে শতদলবাবুকে ধরে ক্ষান্ত তাদের বাবার নায়েবির পদটা পরেশকে যোগাড় করে দিয়েছিল। সে কাজও পরেশ করতো।

অদ্ভুত ছিল লক্ষ্মীর মন। সবই জানতো সে। কিন্তু কোন দিন কোন কাজে স্বামীকে প্রতিবাদ করতো না। ক্ষান্ত এ নিয়ে কোন কথা বলতে গেলে সে হেসে বলতো—দেখ দিদি, সুখ ভাগ্যে না থাকলে কখনও হয় না। এই দেখ না তোমার তো ভাল ঘরেই বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তুমি ক'দিন সুখ ভোগ করলে? ঠাকুরজামাইকে হয়তো তোমার মনেও পড়ে না। তাই, আর কি করবে বল? তাছাড়া এখনও তো উনি বাড়িঘরদোরে আসছেন, দেখা-সাক্ষাৎও

হচ্ছে। কেবল মাঝে মাঝে রাত্তিরে থাকেন না। এ নিয়ে কি আর পুরুষমানুষকে কোন কথা বলা চলে ?

ক্ষান্তর মনে হতো পরেশ ভুল পথে চললেও এক-আধটা ছেলে মেয়ে হলেই বাইরের টান তার চলে যাবে।

কিন্তু বউও যেন বাঁজা! প্রথম চললো দেব-দেবীর নামে পুজো দেওয়া, মানত। আরও কত কি!

তারপরে হলো তারকেশ্বরে ঢ়িল বাঁধা, জড়িবুটি খাওয়া। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হলো না। মাঝে মাঝে ক্ষান্ত রাগ করে লক্ষ্মীকে বলতো—এবার যদি না তোর ছেলে হয়, তাহলে ভায়ের আমার আবার বিয়ে দেব।

কিন্তু বিয়ে আর দিতে হলো না। গ্রাম থেকে চার মাইল দূরে পুলিনবিহারীর মন্দিরে রাসের সময় ননদ আর ভ্রাতৃবধূ গিয়েছিলেন।

পুরোহিতকে ক্ষান্ত মনের দুঃখ জানালো। তিনিও পুজোর দুটি কলা নিয়ে লক্ষ্মীকে খেতে দিলেন।

আশ্চর্য ফল ফললো এবার। বউয়ের সন্তান হবার লক্ষণ দেখা গেল।

ক্ষান্তমণি তো বড় খুশী! এতদিনে তার ভাই আবার সংসারে বাঁধা পড়বে। সন্তানের স্নেহ সে কি আর অস্বীকার করতে পারে ?

কিন্তু এদিকেও দেখা দিয়েছে বিপদ। ইতিমধ্যেই পুতুল দুই সন্তানের জননী হয়ে বসে আছে। কিন্তু কথাটা লক্ষ্মীর কানে যে আসেনি তা নয়। তাই মাতৃত্বের গৌরবে বোধ হয় কোন আনন্দই তার হলো না।

ক্ষান্ত বার বার বলেও সে-সময় তাকে ভালভাবে খাওয়াতেও পারলো না, বা মনের কোন পরিবর্তনও আনতে পারলো না।

অবশেষে দিন ঘনিয়ে এলো। দাই এলো। হাসিমুখে লক্ষ্মী আঁতুড়ঘরে ঢুকলো। কিন্তু পুলিনের জন্মের পরই লক্ষ্মীর মৃত্যু হলো। ছেলেকে সে দু'চোখ ভরে একবার দেখতেও পেলে না। পুলিনবিহারীর কলা খেয়ে হয়েছিল বলেই নবজাতকের নাম হয়েছিল 'পুলিন'।

* *
*

জন্মের পর থেকেই পুলিনকে মানুষ করবার ভার পড়লো ক্ষান্তর ওপর। তাকে নলতে করে দুধ খাইয়ে, মধু খাইয়ে অনেক কষ্টে ক্ষান্ত তার জীবন বাঁচালো।

আর একটা উৎপাত পুলিনকে নিয়ে শুরু হলো তাদের বাড়িতে।

পুতুল ইতিপূর্বে তাদের বাড়িতে আসতো না।

একদিন ক্ষান্ত পুলিনকে তেল মাখিয়ে দাওয়াতে শুইয়ে রেখে পাশেই রান্নাঘরে ঢুকেছিল। কিছুক্ষণ বাদে শিশু পুলিন কি করছে দেখবার জন্যে সে হঠাৎ দৃষ্টি ফেরালো সেদিকে।

কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়েই সে চমকে উঠলো। সেখানে সে তো নেই। তার জায়গায় বসে আছে চুল এলো করে দিয়ে একজন মেয়েছেলে।

হাতের রান্না ফেলে হইহই করে ক্ষান্ত ছুটে এলো। তারপর দেখে, পুতুল তাকে কোলে নিয়ে সস্নেহে তার স্তন তার মুখে দিয়েছে।

—কি করছিস মাগী, কি করছিস?—বলে ক্ষান্ত কর্কশ স্বরে চিৎকার করে উঠলো।

টানা বড় বড় চোখদুটো ক্ষান্তর দিকে তুলে পুতুল বললো—দিদিমণি, ছেলেটা মায়ের দুধ পায়নি। মনে বড় কষ্ট হয়। তাই এলাম ছেলেটাকে দেখতে। এসে দেখি মুখে মাছি বসেছে। আর পেটটা একেবারে পড়ে গেছে। হাঁ করে একেবারে খাই খাই করছে। তাই—

কথা আর শেষ করতে হলো না।

ক্ষান্ত বললো—তাই তুমি সোহাগ করতে বসলে, নয়? যদি বিষ খাওয়াও! আমার বাপের বংশের ওইটুকু সলতে বই তো নয়!

কথার মাঝখানে ক্ষান্ত ছোঁ মেরে পুলিনকে পুতুলের কোল থেকে কেড়ে নিয়েছিল।

এতক্ষণ পুলিন পরম নিশ্চিন্তে পুতুলের স্তন পান করছিল।

হঠাৎ তাতে বাধা পেয়ে সে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলো। পুতুলের কালো টানা চোখদুটো জলে ভরে এলো।

কানে হাত দিয়ে বললো—ছিঃ ছিঃ দিদিমণি, বল কি? আমার নন্দও যা ও-ও তো তাই। আমি কি ওকে বিষ খাওয়াতে পারি? আর বালক তো নারায়ণের সামিল।

ক্ষান্তর রাগ উত্তরোত্তর বাড়ছিল। সে কর্কশ স্বরে আদেশ করলো—যা, এখান থেকে বেরিয়ে যা এখুনি। নইলে আমি লোক ডেকে তোকে বার করে দেব। পুতনা কোথাকার! তোমাকে আর পণ্ডিতগিরি করতে হবে না।

পুতুল আর কথা বাড়ালো না। চোখের জল মুছতে মুছতে সে সেখান থেকে চলে গেল।

রাতে ব্যাপারটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অনেক বড় করে পরেশকে ক্ষান্ত বলেছিল। কিন্তু পরেশ একটা 'হাঁ' বা 'না' কিছুই বলেনি।

ক্ষান্ত আবার কোমর বেঁধে লাগলো পরেশের বিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু পরেশ পরিষ্কার জানিয়ে দিলো সে আর বিয়ে করবে না।

চোখে জল এনে ক্ষান্ত বললো—আমি আর ক'দিন তোর সংসারে আছি পরেশ! তারপর তোকে আর পুলিনকে কে দেখবে?

পরেশ আঁচাতে আঁচাতে জবাব দিলো—সে যাই হোক দিদি, বিয়ে আমি আর করব না।

পরেশের বিয়ে না করার কারণ, পুতুল ছাড়াও আরও একটা ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে মণীন্দ্রের জমানো সব টাকাই খরচা হয়ে গেল। দুটো সংসার তার আয়েতে চলা মুশকিল। রোজগারের নেশায় সে কলকাতায় গিয়েছিল। কিন্তু বুঝেছিল তার বিদ্বেতে কলকাতায় অর্থ রোজগার করা সোজা নয়। তাই সে বিয়েও আর করলো না। অর্থের আকাঙ্ক্ষা তার মনে তীব্র হয়ে দেখা দিতে লাগলো।

ক্ষান্তর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। তার সব রাগ গিয়ে পড়লো ওই হতভাগিনী পুতুলের ওপর। তার মনে হলো ওই পুতুলের জন্যেই তার ভাই পর হয়ে গেল, আর সংসার করলো না। সেইজন্যে সে তার কথাও অমান্য করতে সাহস করলো।

কিন্তু উপায় কি?

সময় কারুর জন্যে অপেক্ষা করে না। এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

পুলিন প্রথম হামাগুড়ি দিল। তারপরে দেওয়াল ধরে দাঁড়ালো। পরে হাঁটি হাঁটি করে সে হাঁটতে শিখলো। অবশেষে সে একদিন নিজের চেষ্টায় বাড়ি থেকে বেরুতেও শিখলো।

নিঃসন্তান হৈমর জীবনে সব চাইতে আনন্দ হতো পুলিনের 'মা মা' ডাকে! তাতেই তার অন্তর ভরে থাকতো।

পুলিন বড় হলো। একদিন গ্রামের পাঠশালাতেও ভরতি হলো। এই পাঠশালার পড়াও শেষ করে সে একদিন ভরতি হলো গ্রামের স্কুলে।

শতদলবাবু তাঁর বাপের মৃত্যুর পর টাকা দিয়ে তাঁর বাবার নামে গ্রামেতে একটা স্কুল করে দিয়েছিলেন।

পরেশের চেষ্টায় বিনা মাইনেতেই পুলিন সেই স্কুলে পড়তে পেলো।

শতদলবাবু ছিলেন সেই স্কুলের সেক্রেটারি। পুলিন লেখাপড়ায় ভাল ছিল বলে তার বই খাতা প্রভৃতি যাবতীয় খরচই শতদলবাবু নিজের থেকেই দিতেন।

এইভাবেই কেটে গেল আরও ছটা বছর।

পুলিন তখন ক্লাস সেভেন বা এইটের ছাত্র। তখন পরেশের গলায় ধরলো ক্যানসার।

প্রথমে কণ্ঠস্বর ভাঙলো। তারপর ধীরে ধীরে তা প্রকাশ পেলো গলার বাইরে। দারুণ যন্ত্রণা। সেবা করবার আজ আর কেউ নেই। ক্ষান্তও চোখে ভাল দেখে না। ইদানীং বাতের ব্যথায় তার শরীরও প্রায় পঙ্গু। পুলিনও তখন ছেলেমানুষ। এ রোগের শুশ্রূষা করা তার সাধ্য নয়। অতএব, ডাক পুতুলকে।

তখন ছোট জাত বলে, বেশ্যা বলে তাকে আর ঘৃণা করা চলে না।

অর্ধেন্দুবাবু মারা যাবার পর থেকে শতদলবাবু গ্রামের বাস তুলে দিয়ে কলকাতায় বাড়ি করেছিলেন। সেইখানেই তাঁর বড়ছেলে দুলালকে তিনি এক সাহেবী স্কুলে পড়ান।

তাঁর মেয়ে শর্মিলাও ভরতি হয়েছে এক মেমসাহেবদের স্কুলে। তাছাড়া জমিদারির আয়ও আগের চেয়ে কমেছে। ফসল ভাল হয়

না। বন্যা, হাহাকার, এ তো নিত্যই লেগে আছে। কিন্তু খরচ তো কমে না! বরং যুদ্ধের পর নিত্যই খরচ বাড়ছে। তাই তিনি কলকাতায় শুরু করেছেন এক লোহার ব্যবসা। ঢালাইয়ের কাজ। তাতে আয়ও হয় প্রচুর। তবে গ্রামের দোল, দুর্গোৎসব, পালপার্বণের সময় শতকাজ থাকা সত্ত্বেও সেখানে হাজিরা দিতেন। গ্রামের লোকের অভাব-অভিযোগের কথা শুনতেন এবং সাধ্যমত তার প্রতিকারও করতেন।

সেবার দুর্গোৎসবের জন্যে তিনি এলেন গ্রামের বাড়িতে। পরেশ তখন উত্থানশক্তিরহিত। পুলিনের হাত দিয়ে সে একখানা চিঠি লিখে পাঠালো ওই শতদলবাবুর কাছে।

পরেশের চিঠি পড়ে শতদলবাবু পুলিনকে বললেন—তোমার বাবাকে বল, আজ সন্ধ্যের পর সময় পেলে আমি তাকে দেখতে যাব।

পরেশের তখন কথা রোধ হয়ে এসেছে।

শতদলবাবু সন্ধ্যের পর এলেন পরেশের বাড়িতে। পুলিন সসম্ভ্রমে তাঁকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। পরেশ তাঁকে দেখে প্রণাম করতে গেল।

দুর্বলতায় উঠতে পারলো না। আধশোওয়া হতেই সে পড়ে গেল বিছানায়।

দু'চোখ দিয়ে তখন নেমেছে তার শ্রাবণের ধারা। অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে আর জড়িয়ে জড়িয়ে সে যেন কি বলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ঘরে উপস্থিত কেউই তা বুঝতে পারলো না।

গ্রামের ডাক্তারের মুখ থেকে শতদলবাবু সব খবরই পেয়েছিলেন, তবুও তাকে বৃথা আশ্বাস দিয়ে বললেন—ভাবছো কেন পরেশ, ভাল হয়ে যাবে তুমি।

ইদানীং সদাসর্বদাই সে মাথার কাছে একটা কাগজ ও পেনসিল

রাখতো। কম্পিত হাতে সে সেটাকে টেনে নিয়ে লিখলো—হুজুর, আর বাঁচবো না। মরতে তত কষ্ট নেই কেবল ভাবনা এই ছেলেটার জন্য। আমরা দু'পুরুষ আপনাদের গোলাম। আমার সব অপরাধ ক্ষমা করবেন। এই ছেলেটাকে পায়ে ঠেলবেন না। আপনার আশ্রয়ে রাখবেন।

শতদলবাবু বললেন—পরেশ, এত ভাবছো কেন? তোমার পুলিন লেখাপড়ায় ভাল ছেলে। আমার সুলালও ওর বয়সী। ও মানুষ হবেই। তার জন্যে চিন্তা কি? আমি কথা দিলাম, আমি ওর সব ভার নিলাম।

তারপর আরও খানিক নীরবতা। সকলেই বুঝেছে যে মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। তার হাত থেকে তো রক্ষা কারো নেই! উপস্থিত তার লক্ষ্য ঐ পরেশ। তার নিঃশব্দ আগমনে সকলের মনই ভারাক্রান্ত। উপায় নেই। সকলেই অসহায়। শতদলবাবুই সেই ঘন নীরবতা ভেঙে প্রথম কথা বললেন—কি জান পরেশ, আমি এই গ্রামের ছেলে, তোমরা সকলেই আমার আপনজন। বাবাকে জানতে—তিনি সব প্রজা, নায়েব, গোমস্তাদের নিজের ছেলের মতই দেখতেন। আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন—"দেখ্‌, শতু! সব সময় জানবি, এরাই তোর আপনজন। সংসারের নিয়ম বড় বিচিত্র। আজ যে রাজা, কাল সে ফকির। আবার দেখবি, তুই যাকে ফকির বলে জানিস, সেই হয়তো তখন রাজার আসনে বসেছে। কষ্ট হবে তোর, তবুও তুই যদি এদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে যাস, তাহলে দেখিস এরা কখনও তোকে ছাড়বে না।" কলকাতায় যেতে বললে বলতেন—"ক'দিনই বা বাঁচবো! বাকী দিনগুলো আমার যেন এখানেই কাটে। সেখানে তোদের আছেটা কি? উগ্র সাহেবিয়ানা! সারা দিনরাত ধরে তারা ছুটে বেড়াচ্ছে—'হা টাকা, জো টাকা!' সেখানে একটা

মানুষের চেয়েও একদলা সোনার দাম অনেক বেশী। কথা কইবার লোক নেই। না, ওখানে গেলে আমি শান্তি পাব না। তার চেয়ে বরং যে ক'টা দিন আছি আমাকে এখানেই থাকতে দে।" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি আবার বলেন, কিন্তু সময়ের সঙ্গে চলতে গিয়ে আমায় কলকাতায় যেতে হলো। কাজের প্রয়োজনে আমাকে এখন সেখানে থাকতেও হয়, কিন্তু ছেলেগুলো আর এলো না। এখানে ইলেক্‌ট্রিক আলো নেই, পাখা নেই, চলতে গেলে পায়ে হেঁটেই চলতে হয়—মোটর চড়বার উপায় নেই। তাছাড়া…। যাক সেকথা। রাত হয়ে যাচ্ছে। আমি আজ উঠি বরং। তুমি ভেব না। পুলিনের ব্যবস্থা একটা হবেই। ভগবান যখন তাকে পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে, তখন ওর খাবারের ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন।

পরেশ পুলিনের হাতটা ধরে শতদলবাবুর হাতে দিল। তারপর জোড়হাতে তাঁকে প্রণাম জানালো।

আরও তিন মাস ভুগে পরেশ মারা গেল। ক্ষান্ত বুড়োবয়সে এ শোক সহ্য করতে পারলো না। সেই যে সে বিছানা নিল, আর উঠলো না। দু'মাসের ভেতর ওই কিশোর পুলিনকে সংসার-সমুদ্রে একা ফেলে ক্ষান্তও চলে গেল।

* * *

পুলিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। ক্ষান্তর মৃত্যুর পর প্রতিবাসিনীদের নির্দেশে লোকজন ডাকতে আর জমিদারবাড়ি খবর দিতে সে বার হয়েছিল বাড়ি থেকে। কারণ ক্ষান্ত আর পরেশের চিকিৎসা করাতে টাকা আর ধান, সবই তখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। জমি বলতে তার আর বিশেষ কিছু নেই। সেসব তখন বাঁধা পড়েছে গ্রামের তেজারতি কারবারী মল্লিকদের কাছে। ক'দিন আগে ক্ষান্তর নির্দেশেই সে তার দুঃখ-কষ্টের কথা

জানিয়েছিল জমিদারের সেরেস্তাতে। ওই জটের বাবা কেদারবাবু তখন সেখানকার নায়েব।

কেদার একটু বিদ্রূপের স্বরেই বলেছিল—দেখি, তোর কথা জানাই বাবুকে! তিনি কি বলেন! তোর তো এমন অবস্থা হবার কথা নয়! তোর বাপ যে সব ঢাললে ওই মাগীর পেছনে। তখন কি শুনলে আমার কথা!

কেদারের মুখে একথা শুনে পুলিন তো বিস্মিত। এমন কথা সে তো কখনও শোনেনি! মাগী বলতে কেদার কাকে বোঝাচ্ছে?

এখন কেদারেরও প্রকাশ্য জায়গায় পুতুলকে অপমান করবার একটা কারণ ছিল। আগে পুতুলের সঙ্গে পরেশের ঘনিষ্ঠতার কথা গ্রামে ছড়িয়ে পড়বার পরই কেদারও চেয়েছিল যুবতী পুতুলের সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতাতে।

সে ঘুরঘুর করতো পুতুলের বাড়ির আনাচেকানাচে, কিন্তু পুতুল তা ভ্রুক্ষেপও করতো না।

আকার-ইঙ্গিতে তার ভালবাসা বোঝাতে চাইলেও সে এমন একটা ভাব দেখাতো, যার অর্থ হলো সে এ ব্যাপারের কিছুই বোঝে না।

কিন্তু যে কথা না বলে, তার সঙ্গে জোর করে তো কথা বলা যায় না!

কেদার একদিন মরিয়া হয়েই পুতুলকে বলে উঠলো—বলি হ্যাঁরে পুতুল, তুই যে দেখেও দেখিস না, শুনেও শুনিস না। বলি, তোর ব্যাপার কি বল্ তো?

পুতুল নম্রভাবেই জবাব দিয়েছিল—বাবুমশাই, আমরা ছোট-লোক, আমাদের কি চারদিক দেখে চললে চলে?

কেদার বলে—তার মানে?

পুতুল বলে—আমরা এঁটো পাতা, যেখানে আছি

সেইখানেই থাকা ভাল। অন্য জায়গায় রাখলে আবার নতুন করে যে গোবর দিয়ে নিকোতে হবে!

কেদার আরও কি যেন বলতে গিয়েছিল, কিন্তু বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলো সেখানে আর পুতুল দাঁড়িয়ে নেই।

তারপর পরেশের বিয়ের দিন ইচ্ছে করেই কেদার পুতুলের বাড়ির কাছে গিয়েছিল। ভেবেছিল, আজ বোধ হয় পুতুল কাঁদবে। তাকে দুটো সান্ত্বনার কথা বললে হয়তো সে তার দিকে ঢলবে!

কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখলো বাড়ির সামনে একটা অশথগাছে ঠেস দিয়ে পুতুল বসে আছে। তার দৃষ্টি উদাস। সামনের মাঠের দিকে চেয়ে আছে। ওই মাঠের পরেই আছে পরেশদের বাড়ি।

দূর থেকে অন্ধকারে চোখে ভাল দেখা যাচ্ছে না। কেবল একটা জমাট কালো বিন্দুর মত সেটা চোখে পড়ছে। হাওয়ায় মাঝে মাঝে ভেসে আসছে অতি ক্ষীণভাবে শাঁখের আওয়াজ। তাতেই বোঝা যাচ্ছিল ওখানে বর বেরোবার সময় হয়েছে।

পুতুলকে যে এত সহজে বাইরেই পাওয়া যাবে এটা কেদার ভাবতে পারেনি। তাই সে চুপি চুপি চোরের মতন পা টিপেই এসেছিল। কিন্তু পুতুল তার দিকে চেয়েও দেখলো না।

কেদার একবার গলা খাঁকরি দিয়ে তার উপস্থিতি জানালো, কিন্তু পুতুল শুনতেই পেলো না। তার মন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে কোন্ রাজ্যে কে জানে!

তার উপস্থিতি বোঝাবার জন্যেই কেদার এবারে পুতুলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বিস্মিত হয়ে দেখলো পুতুলের বুকের কাপড় ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে!

কেদার এবার তাকে ডাক দিয়ে বললো—পুতুল!

চোখ মুছে তাড়াতাড়ি পুতুল মাথায় কাপড় দিল। তারপরে শান্তভাবে বলে—বলুন বাবু!

কেদার বলে—বলি, এ অন্যায়, অবিচার। তোর সঙ্গে বেইমানি করেছে।

বিস্মিত হয়ে গিয়ে পুতুল বললো—বেইমানি, কে করেছে বাবু?

কেদার বললো—কেন, পরেশ!

পুতুল বলে—তিনি? কই, না তো!

কেদার একটু উত্তেজিত হয়ে গিয়েই বলে—করেনি আবার? তোকে ফেলে বিয়ে করতে যাচ্ছে!

পুতুল এবার দৃঢ়ভাবে জবাব দিল—তাঁকে বিয়ে করতে আমিই বলেছি। নইলে তিনি বিয়ে করতে যেতেন না।

এ উত্তরের জন্যে কেদার প্রস্তুত ছিল না। ভেবেছিল, এই অমোঘ শরে পুতুলকে সে ঘায়েল করবে। তারপর পরেশের উদ্দেশে দু'একটা গালাগালি বর্ষিত করে সে পরেশের স্থানে বসবে।

তাই অপ্রস্তুত কেদারের মুখ থেকে বেরুলো—তুই বলেছিস?

দৃঢ়কণ্ঠে পুতুল জবাব দিল—হ্যাঁ, আমি বলেছি। বউ না হলে কি বাড়ি মানায়? বিধবা বোন আর কতদিন হাত পুড়িয়ে সংসার চালাবে? ছেলেপুলেও তো দরকার। নইলে পিতৃপুরুষকে জল দেবে কে?

কেদার তো থ'। কোন কথা খুঁজে পায় না।

পুতুল এবার প্রশ্ন করে—তা আপনি এসেছেন কেন?

কেদার বলে—না, মানে আমি এসেছিলুম···ভাবলুম তোকে একটু সান্ত্বনা দিই। যদি কোন দরকার থাকে তাই দেখি। আর—

পুতুল একটু হেসেই বললো—তেনার শূন্যস্থানে যদি পারেন বসবেন? বাবুমশাই—পুতুল ছোটলোকের মেয়ে, গতর খাটিয়ে খায়। কারুর পরোয়াই সে করে না। আপনারা লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক। আপনিই বলুন না, কারুর খালি জায়গা অন্য লোককে দিয়ে কি ভরানো যায়?

নম্রভাবে হলেও কথাটার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল তা বুঝতে কেদারের দেরি হলো না। তাই সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললো—তোর যে বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হয়েছে! ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস?

পুতুল বলে—না, বাবু। এই পিথিবীটাকে আমি পিথিবীই মনে করি। তবে কি জানেন, যে বাঘের সঙ্গে ঘর করে, তার কি শেয়ালকে চিনতে ভুল হয়? শেয়াল সন্ধ্যার আঁধারেই পা টিপে টিপে চুরি করতে আসে। আর বাঘ দিনের বেলায় সকলকার সামনেই কেড়ে খায়। কেন, বিন্দী পিসী কি আজ তাড়িয়ে দিয়েছে আপনাকে? আমি বিন্দী পিসী নই।

বিন্দী পুতুলের চেয়ে দু'চার বছরের বড়। দেখতে কালো হলেও আকর্ষণ আছে। তবে পুতুলের মত এতখানি জলুস নেই। গ্রাম-ঘরের অনেকেই লুকিয়ে সন্ধ্যেবেলাটায় বিন্দীর ওখানে যাতায়াত করে। সে কথা কারুরই অজানা নেই।

পুতুল আর দাঁড়ায় না। কেদারের সামনে সে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। তারপর ভেতর থেকে দেয় দরজা বন্ধ করে।

দরজা বন্ধ করবার সময় সে চেঁচিয়ে বলে—এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, সাপে কাটতে পারে। তাতে লোকে জানবে আপনি আমার বাড়ি এসেছিলেন।

উত্তরের প্রত্যাশা সে আর করে না।

এর পর থেকেই কেদার আর পুতুলের দিকে হাত বাড়ায়নি। কিন্তু তার গায়ের ঝালও মেটাতে পারেনি।

ধান ঝেড়ে, মুড়ি ভেজে আর দূরের হাটে মাছ বিক্রি করে তার দিন চলে যেত। কারুর তোয়াক্কাই সে কোনদিন করতো না। কারণ পরেশের টাকা দেবার মত ক্ষমতা আর তখন ছিল না।

ইচ্ছে থাকলেও কেদার তাই তার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারেনি। তাই আজ অসহায় পুলিনকে পেয়ে সেই কথা তুলেই তার গায়ের ঝাল খানিকটা মেটালো।

কিশোর পুলিন এর কি জবাব দেবে! আর এ ব্যাপারটাও তার মাথায় খেলেনি। তাই সে একটু বিস্মিত হয়ে গিয়েই বললো—কে, কার পেছনে জেঠামশাই, বাবা টাকা ঢেলেছে?

কেদার আরও চেঁচিয়ে বললো—ওঃ, ন্যাকা সাজছে! যেন কিছুই জানে না। আরে তোর বাপকে যে অসুখে সেবা করেছিল, সে কি এমনি করেছিল? সে যে তোর সৎমা হয় রে! হবে না, গলায় ঘা! গ্রামে বসে এতখানি অধর্ম কি ধর্ম সহ্য করে!

পুলিনের মন তার মৃত বাপের ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে। এতখানি? তার বাপ,—

মাথার ভেতর যেন কেমন ঝাঁঝাঁ করে ওঠে। পুতুলকে সে নিঃস্বার্থপর বলেই মনে করতো। পিসী শুয়ে শুয়ে তাকে গালাগালি দিলেও মনে মনে সে এতদিন বিরক্তই হয়েছে। এখন তার সব মনটা পুতুলের ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে।

যাক, করবার কিছুই নেই। সবটা সে বোঝেনি। কিন্তু যতখানি সে বুঝেছিল, তাতে এইটুকু বুঝেছিল, পুতুল অপরাধী, তাকে ক্ষমা করা চলে না।

তাই আজ ক্ষান্ত মারা যেতে সে ভেবেছিল মল্লিকদের ওখান থেকে কিছু টাকা চেয়ে আনবে। তারপর বাড়ি-ঘরদোর বিক্রি করে দিয়ে সে সে-টাকা শোধ করবে। সব শেষ হয়ে গেলে সে যেখানে হয় চলে যাবে। লোকের বাড়িতে চাকরগিরি করবে, কিন্তু এই গ্রামে আর থাকবে না।

সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে। পিসীর প্রতি

ভালবাসা, কান্না তার তখন একেবারে শুকিয়ে গেছে চোখ থেকে।

কিন্তু বাড়ি থেকে খানিকটা বার হয়ে গ্রামের দিকে যেতেই সে দেখে একটা গাছের নীচে পুতুল দাঁড়িয়ে আছে।

জায়গাটা একটু নির্জন।

পুলিন চোখ ফিরিয়ে নিয়ে পুতুলকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ সে শুনতে পেল—"খোকা", "খোকাবাবু!"

পুলিন কোন সাড়া দেয় না।

বোধ হয় তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেই পুতুল তার জায়গা থেকে ছুটে আসে। তারপর পেছন থেকে তার হাতটা ধরে ফেলে বলে—কোথায় যাচ্ছ?

জোর করে পুলিন পুতুলের হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু পুতুলের শক্ত হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না।

উদ্ধতস্বরে সে জবাব দেয়—তোমার কি দরকার? যেখানেই যাই না কেন!

একটু জোরের সঙ্গে পুতুল বলে—দরকার আছে বলেই জিজ্ঞেস করছি।

তারপর অপেক্ষাকৃত নরম এবং মিষ্ট স্বরে বলে—ছিঃ বাবা, এ সময় কি মাথা গরম করতে আছে! তুমি একমাত্র তাদের ভরসা ছিলে। তোমার কি রাগ করলে চলে!

কথাটা বলতে বলতে পুতুল তাকে জোর করেই নিজের বুকের কাছে টেনে আনলো। তারপরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—তোমাকে এখন পিসীর সব কাজ করতে হবে, শান্ত হও বাবা!

কথাটা বলতে বলতেই পুলিন অনুভব করে তার মাথার ওপর টপটপ করে গড়িয়ে পড়ছে তপ্ত চোখের জল।

এই কান্নাটা বোধ হয় ছোঁয়াচে রোগ। একজনকে কাঁদতে দেখলে মানুষের মন ভারাক্রান্ত হয়। অপরের সঙ্গে তারও তখন কাঁদবার ইচ্ছা হয়। পুলিনের শোকার্ত হৃদয় পুতুলের চোখের জল অনুভব করে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। আর কিছুক্ষণের মধ্যে সেও অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

কান্নার সঙ্গে চোখের জলে তার মনের সব পুঞ্জীভূত অভিমান ধুয়ে গেল।

খানিকক্ষণ ধরে ঐভাবে কাঁদবার পর আঁচলের খুঁট দিয়ে পুতুল তার চোখ মুছিয়ে দিল।

তারপরে তার মাথায় হাত দিয়ে বলে—ভয় কি বাবা! আমি আছি! কোথায় যাচ্ছিলি এখন? লোক ডাকতে?

পুলিন বলে—হ্যাঁ, আর একবার মল্লিকদের বাড়ি যাব।

পুতুল প্রশ্ন করে—কেন রে?

পুলিন বলে—টাকা নেই। এখন তো পিসীকে পোড়াতে হবে।

আঁচলের খুঁট থেকে পঞ্চাশটা টাকা বার করে সে পুলিনের হাতে দিয়ে বললো—এখন এই টাকাটা নিয়ে যা। এইতে পিসীর কাজ কর। তারপর ধীরেসুস্থে যা ব্যবস্থা হয় করবি।

পুলিন বলে—টাকাটা তোমায় ফেরত দেব কি করে?

নিঃসংকোচে পুতুল বলে—তোকে দিতে হবে না।

পুলিন বলে—তাহলে আমি এ টাকা নেব না, তুমি ফেরত নাও।

পুতুল একটু দৃঢ়তার সঙ্গেই বলে—নে, আমি বলছি, পরে রোজগার করে আমায় টাকাটা ফেরত দিস। দেখ খোকা, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার চেষ্টা কর। তোর বাপের অনেক আশা ছিল তোর ওপর।

পুলিন আর কিছু না বলে সেখান থেকে চলে আসে।

দিনের যে-কোন সময়েই হোক পুতুল একবার এসে পুলিনকে দেখে যেত। সে কি খাচ্ছে, কোথায় আছে, স্কুলে যায় কি না, সব খবরই সে রাখতো।

একবার পুতুল বলেছিল তাকে তার বাড়িতে গিয়ে থাকতে। কিন্তু পুলিন রাজী হতে পারেনি, আর গ্রামের লোকে কি বলবে বলে পুতুলও সে কথাটা আর বেশী বলেনি।

অবশ্য যে ক'দিন পুলিন তার নিজের গ্রামের বাড়িতে ছিল, সেই ক'দিনই পুতুল রাত্রে তার বাড়িতে থেকে তাকে পাহারা দিত।

এমনি সময় একদিন হঠাৎ সকালবেলায় কেদার এসে পুলিনকে বলে—ওরে ছোঁড়া, তোর ভাগ্য ফিরে গেল। তুই তো এবারে নবাবপুত্তুর হতে চলেছিস!

সেদিনকার ঘটনা থেকে পুলিন কেদারকে এড়িয়েই চলতো। বিশেষ কথা তার সঙ্গে বলতো না।

আজকে কিন্তু সে বিস্মিত হয়ে গিয়ে বললো—কি হয়েছে জেঠামশাই?

কেদার অনেক শাখাপল্লব সহকারে যা বললো তার অর্থ হলো এই: তার ছেলে জটি কাল রাত্রে বাড়ি এসেছে। আজই সে দুপুরের গাড়িতে কলকাতায় ফিরে যাবে। তার ওপর জমিদারের হুকুম হয়েছে পুলিনকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। ও সেইখানেই থাকবে। আর সেইখানে থেকেই পড়াশুনা করবে।

পুলিন কলকাতায় যাবে। আনন্দে তার মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি সেই খবরটা সে খেলার সাথীদের দিতে গেল।

পুতুলের কাছেও গিয়েছিল, কিন্তু সে তখন বাড়ি ছিল না। দূরের হাটে মাছ বিক্রি করতে গিয়েছিল।

খবরটা মুখে মুখে রটে গেল গ্রামে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। জমিদারবাবুর অহেতুক করুণা, না এ নতুন কোন শোষণ করবার চাল, তা নিয়ে অনেকেই গবেষণা করতে বসলো। কিন্তু পুলিনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও রইলো না।

বারোটা-সাড়ে বারোটার সময় হাট থেকে ফিরে পুতুল খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল তার কাছে। পুলিন তখন ঘরদোরে চাবি দিতে ব্যস্ত।

পুতুলকে দূর থেকে আসতে দেখেই সে চেঁচিয়ে বললো—আমি আজ কলকাতায় চলে যাচ্ছি। এখন সেখানে থাকবো।

পুতুল বলে—ছিঃ, তা কি ভাল বাবা! বাপ-পিতামহের ভিটে আঁধার হয়ে থাকবে, সন্ধ্যে পড়বে না, তা হয় না। তুই এখন যা, লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে আবার ফিরে আয়। ভগবান তোর মঙ্গল করবেন।

পুলিন ঘরদোর বন্ধ করে চাবিটা পুতুলের হাতে দিতে যাচ্ছিল। পুতুল না নিয়েই বললো—তোর কাছেই রেখে দে। তুই আবার ফিরে আসবার সময় তখন যদি না বাঁচি, তখন কে দেবে তোর চাবি?

আসবার সময় ময়রার দোকান থেকে পুতুল এক টাকার সন্দেশ এনেছিল। শালপাতার ঠোঙাটা পুলিনের হাতে দিয়ে বললো—গাড়িতে খিদে পেলে খাস। তারপর সজল চোখে তাকে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁরে খোকা, আমাকে তোর মনে থাকবে কলকাতায় গিয়ে?

পুলিন বলে—হ্যাঁ।

পুতুল বোধ হয় আর নিজেকে সংযত করতে পারে না। হুহু করে কেঁদে ফেলে।

সামান্য দই সে ময়রার দোকান থেকে সংগ্রহ করে এনেছিল।

তাতেই পুলিনের কপালে একটা ফোঁটা দিল। তারপর যা সে কখনও করেনি, তাই করলো। শিশুর মতন পুলিনকে জড়িয়ে ধরে তার মুখে চুমু খেল।

পুলিন লজ্জা পেয়ে বলে—ধ্যেৎ!

পুতুল একটু হাসে।

সদর দরজাটা বন্ধ করতে করতে পুলিন বলে—তাহলে যাই?

সভয়ে পুতুল বলে—যাই বলতে নেই পাগলা, বলতে হয় আসি। তারপর তার ভয়ার্ত কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে—দুর্গা, দুর্গা, ভগবান তোর মঙ্গল করুন!

পুলিন তখন ছুটেছে নতুনের টানে—জীবনের পরিবর্তনের আনন্দে।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে রায়দের পুকুরটা বাঁদিকে রেখে বাঁক ফেরবার সময় পুলিন চাইলো পেছন দিকে। কারণ এইখান থেকেই তাদের বাড়িটা শেষ দেখা যায়। রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে বলে আর দেখা যায় না।

পুলিন দেখে ব্যথাতুর চোখে তার দিকে তখনও পুতুল অপলকে চেয়ে আছে।

* *
*

সন্ধ্যার অন্ধকারে পুলিন যখন কলকাতায় এসে পৌঁছুলো, তখন কলকাতা শহরের পথে পথে আলো জ্বলে উঠেছে। রাত্রি বোধ হয় আটটা বেজে গিয়েছিল, তবু রাস্তায় কি ভিড়! মোটর, বাস, ট্রাম—যেন সব জায়গাই গমগম করছে। পুলিনের মনে

হলো এমন ভিড়, রাস্তায় এত সমারোহ তাদের গ্রামে পুজোপার্বণেও হয় না। কলকাতার কথা সে অনেক শুনেছে, কিন্তু চোখে দেখেনি। তবুও সে একটু বিস্মিতই হলো আলোগুলোর মাথায় কেমন যেন ঠুঙ্গি লাগানো থাকায়। প্রত্যেক আলোর সঙ্গে রয়েছে একটা করে দড়ি। এর কারণটা সে ঠিক বুঝতে পারলো না। তাই একটু বিস্মিত হয়েই সে জটিকে প্রশ্ন করলো—আলোগুলোর মাথায় ওই ঠোঙ্গাগুলো লাগানো আছে কেন জটিদা?

জটি বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললো—ওরে গেঁও ভূত! জানিস না, কলকাতায় ব্ল্যাকআউট হয়েছে! নইলে কলকাতার সব আলো দেখলে তোর মাথা বনবন করে ঘুরতো!

'ব্ল্যাক আউট' কথাটা তার কাছে নতুন, তবে ব্ল্যাক আর আউট দুটি শব্দের মানে তার জানা ছিল। মনে মনে তাই সে বললো "কালো বেরিয়ে যাওয়া"। নাঃ, কথাটা ঠিক বোধগম্য হলো না। তাই সে আবার জিজ্ঞেসা করলো—ব্ল্যাকআউট মানে কি জটিদা?

জটিদার বিদ্যেও তদ্দূর। কেদারের সুপারিশে সে কলকাতার বাড়ির বাজার-সরকারের কাজটা পেয়েছিল। বাড়িভাড়া আদায় করা, সংসারের বাজার করা, আর মিস্ত্রী লাগিয়ে ভাঙা ভাড়াটে বাড়ি মেরামত করানোই ছিল তার কাজ। এত খবর তার জানবার কথা নয়। তবু নিছক কৌতূহলবশে যখন সকালে বাড়িতে কাগজ দিয়ে যেত, সেটা সে নাড়াচাড়া করতো। কথাটার মানে তার জানা ছিল তাই সে গম্ভীর হয়ে বললো—"নিষ্প্রদীপ"! এ কথাটা পুলিনের কাছে ইংরেজী কথাটার চেয়েও শক্ত লাগলো। কোনও কথারই মানে বুঝতে না পেরে সে তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

—আরে মুখ্যু! জানিস না ইউরোপে যুদ্ধু হচ্ছে? সেদিন কলকাতায় বোমা পড়েছিল?

হ্যাঁ, এ কথাটা পুলিনের জানা ছিল। তখন কলকাতা থেকে পালিয়ে অনেক লোক তাদের গ্রামে গিয়েছিল। ইওরোপের ম্যাপে সে দেখেছিল ইংলণ্ড আর জার্মানির অবস্থান। সে জানতো যে, ইংলণ্ডের রাজা জার্মানির হিটলারের সঙ্গে লড়ছে। ইংলণ্ডের নীচেই ফ্রান্স, তার পাশেই বেলজিয়াম। এই বেলজিয়ামের ভেতর দিয়ে এসে জার্মান সৈন্য ফ্রান্স অধিকার করেছে, কিন্তু তারা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে বিলেতে পৌঁছুতে পারেনি। দু'পক্ষই দু'পক্ষের ওপর এরোপ্লেনে গিয়ে বোমা ফেলছে। যুদ্ধ বোধহয় এতদিনে শেষ হয়েই যেত, কিন্তু হঠাৎ হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে বসেছে। এখন তাকে লড়তে হচ্ছে দু'জনের সঙ্গে। এবার ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া আর আমেরিকা একদিকে। অপর দিকে ইটালি, জার্মানি আর জাপান। এসব খবর সে গ্রামে মুদিখানার কাগজে, কিংবা বয়স্কদের কাছে শুনেছে। এটা মনে থাকার আর একটা কারণও আছে। জাপান যখন যুদ্ধ ঘোষণা করে, সেই শীতকালে পিলপিল করে লোক তাদের গ্রামে গিয়েছিল। তার বাবার মুখে সে শুনেছিল যে, তারা সব সেই গ্রামেরই লোক। বহুদিন আগে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল কলকাতায় রোজগারের আশায়। এখন নাকি জাপানীরা বর্মা জিতে নিয়েছে। কলকাতায় বোমা পড়বে, তাই ওরা পালিয়ে এসেছে ভয়ে।

পুলিন এ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারতো না। পিসীমার মুখে ছেলেবয়সে রূপকথা, রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনে তার কেমন একটা ধারণা হয়েছিল যে যুদ্ধ হয় একটা মাঠের মধ্যে—নির্দিষ্ট সীমানায়। সেখানে এক পক্ষের সৈনিক অপর পক্ষের সৈনিকের সঙ্গে হাতাহাতি লড়ে। অবশ্য আগেকার লোকেরা যুদ্ধ করতো তীর-ধনুক আর তলোয়ার নিয়ে।

সে জায়গায় আজকালকার লোকে লড়ে কামান-বন্দুক নিয়ে।

বোমা যদি পড়েই তবে পড়া উচিত সেই যুদ্ধক্ষেত্রে। শহরে তা পড়বে কেন?

কিন্তু সে মাঠ কোথায়? কোন্ মাঠে যুদ্ধ হচ্ছে?

আধুনিক ইতিহাসে সে পড়েছে ইংরেজদের সঙ্গে বাঙলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলাও লড়েছিলেন পলাশীর মাঠে। দিল্লীর পানিপথের যুদ্ধ তো ইতিহাসবিখ্যাত। তিন-তিনবার তা ভারতের ইতিহাস বদলে দিয়েছে। এসব কথা সে স্কুলে স্যারের মুখে শুনেছে।

যারা গ্রামেতে পালিয়ে গিয়েছিল তারাই আবার দু'তিন মাস থেকেই জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়ে, কলকাতায় কিছু হলো না বলে আবার ফিরে এসেছিল নিজেদের ডেরায়। অনেককে ফিরতে হয়েছিল অসুখবিসুখে।

এসব কথা সে শুনেছে। এর কিছু পরেই গ্রামেতে শুরু হয়েছিল বিয়াল্লিশের আন্দোলন।

উঁচু ক্লাসের ছেলেরা তাদের লাইন বেঁধে সাজিয়ে 'বন্দে মাতরম্' বলে ঘুরে বেড়িয়েছিল গ্রামে গ্রামে।

একদল ছেলে নাকি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও যাচ্ছিল। সে-ও সেই দলে ছিল। কিন্তু হঠাৎ মিছিলের মাঝখানেই তার দেখা হয়েছিল পুতুলের সঙ্গে।

পুতুল তখন দূরের হাট থেকে বাড়ি ফিরছিল। তাকে দেখে পুতুল প্রশ্ন করে—খোকাবাবু, কোথায় যাচ্ছ?

সে বলে—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে।

পুতুল প্রশ্ন করে—কেন?

—সাহেবদের চলে যেতে হবে এখান থেকে।

—তারা যাবে কেন?

—আমরা বললেই ওরা চলে যাবে।

পুতুল বলে—না, তারা যাবে না, তারা যুদ্ধ করবে।

প্রতিবাদের সুরেই পুলিন বলেছিল—ঠিক যাবে, এত লোক যাচ্ছে—

তার কথাটা তাকে শেষ করতে না দিয়েই পুতুল বলে—তা যাক, তুমি যেতে পাবে না। আমার সঙ্গে তুমি বাড়ি ফিরে চল। নইলে আমি গিয়ে তোমার বাবাকে বলে দেব!

পরেশ তখন বিছানায় শুয়ে। তার সেবাশুশ্রূষার জন্যে পুতুল দিনরাতই সেখানে যাতায়াত করে।

পুলিন পুতুলের কথা শুনে ভয় পায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে ফিরতে রাজী হয়। কিন্তু তার মন পড়ে থাকে ছেলের দলের মিছিলের ওপর।

পুতুলের ওপর তার ভারী রাগ হয়েছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। সারাটা রাস্তা সে মুখ গম্ভীর করে ফিরে এসেছিল।

গ্রামের মধ্যে ঢুকে ভুতি ময়রার দোকানের সামনে যেতেই পুতুল জিজ্ঞেস করলো—কিছু খাবে, খাবার কিনব? অনেকক্ষণ আগে তো খেয়ে বেরিয়েছিলে। তারপর হেঁটেছ তো এক ক্রোশ পথ!

—নাঃ, বলেই সেখান থেকে ছুটে পুলিন পালিয়েছিল। তার পরদিন তাদের স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সে শুনেছিল, কলকাতায় ছেলেদের ওপর গুলি চলেছে। তারপর দীর্ঘদিন পরে তার স্কুল খুলেছিল। এর পরে নাকি কলকাতায় শীতকালে বোমা পড়েছিল। দু'চারজন লোক কলকাতা ছেড়ে তখন গ্রামেতে পালিয়ে এসেছিল। তবে আগের বছরের মতন লোক আর আসেনি।

এত খবরই সে জানতো, কিন্তু নিষ্প্রদীপ কথাটা তার শোনা ছিল না। তাই সে আবার জটিকে প্রশ্ন করলো—এর মানে কি জটিদা?

জটিদা বলে—এর মানে, যদি কলকাতায় বোমা পড়ে তখন তাড়াতাড়ি রাস্তার আলো নিবিয়ে দেওয়া হবে।

পুলিন বললো—তাহলে লোকে রাস্তায় চলাফেরা করবে কি করে? হারিকেন নিয়ে?

জটিদা বলে—সাধে বলে মুখ্যু! সাইরেন বাজলে কি লোকে রাস্তায় ঘোরে? তখন বাড়ির মধ্যে ঢুকে থাকতে হয়।

ঠিক এই সময় ট্রাম ঘুরলো ডান দিকে। সামনের একটা বিরাট বাড়ি দেখিয়ে জটিদা বলে—এটা দেখে রাখ, এটা শেয়ালদা।

পুলিন জিজ্ঞেস করে—আমাদের কোথায় যেতে হবে?

জটি বলে—ইটালী। সেখানে বাবুদের বাড়ি। সে কত বড় বাড়ি! তুই জীবনেও দেখিসনি। দেখলে একেবারে পেটের পিলে চমকে যাবে।

পুলিন বললো—বাবুর সঙ্গে এখন দেখা হবে?

জটি বলে – না, কাল সকালে দেখা হবে।

পুলিন বলে—তাহলে আমি থাকবো কোথায়?

জটি বলে—কেন, আমি ব্যবস্থা করব, আমার কাছে। তোর কোন ভাবনা নেই। আমিই তো তোর কথা বাবুকে বলেছিলাম। তাইতো বাবু তোকে দেশ থেকে আনতে হুকুম দিলে। নইলে কি দিত! দেখ ছোঁড়া, যা বলব তাই শুনবি। আমার কথা যদি না শুনিস, তাহলে জানিস, কান ধরে তোকে তাড়িয়ে দেব। তখন স্বয়ং বাবুও তোকে আটকাতে পারবে না। হ্যাঁ, বলে দিলাম।

পুলিন মাথা নেড়ে জবাব দেয় সে সব বুঝেছে। কথা বলতে সাহস করে না। মনে মনে ভাবে জটিদা কি এলেম-বস্ত্র লোক রে বাবা!

সকালে প্রথমেই নীচে নেমে শতদলবাবু তার খোঁজ করলেন।

জটির শেখানো মতন পুলিন ঘরে ঢুকেই তাঁকে ঢিপ করে একটা প্রণাম করলো। গ্রামের যে জমিদার শতদলবাবুকে সে জানতো, এ যেন সে-লোক নয়। পরনে বিলিতী পোশাক, মুখে বর্মা চুরুট।

তার আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে শতদলবাবু বললেন—হ্যাঁরে, কাল আসতে কোন কষ্ট হয়নি তো?

পুলিন বলে—না।

—ওপরে যাসনি কেন?

এ প্রশ্নের সে কি জবাব দেবে? একবার ইচ্ছে হলো বলে, জটিদা বারণ করেছিল। কিন্তু তা না বলে সে চুপ করেই রইলো।

জটিদা তার হয়ে জবাব দিল—আজ্ঞে, হুজুর, আমরা অনেক রাত্রে ফিরেছিলাম।

—অনেক রাত্রে মানে ক'টায়?

জটির এবার মুশকিল হলো কথার জবাব দেওয়ার।

—মানে সাড়ে ন'টা দশটা হবে আর কি, ঘড়িটা ঠিক দেখিনি।

শতদলবাবু বললেন—ওকে পাঠিয়ে দিলেই পারতে, আমি তো তখন জেগে ছিলুম। একটা বাচ্চা ছেলে এলো বাড়িতে…। যাক ওসব কথা। ওর বাড়ি-ঘরদোরের কি ব্যবস্থা করে এলে?

জটি মাথা চুলকে একটু আমতা আমতা করে বলে—এখন তালা দিয়েই এসেছি, তারপরে বাবা তো আছেন, তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন।

বলা বাহুল্য, জটি বা কেদার কেউই তার বাড়ি-ঘরদোরের কোন ব্যবস্থাই করেনি। পুলিন নিজেই তালা দিয়ে এসেছিল।

শতদলবাবু বলেন—হ্যাঁ, জটি, ওর জামা কাপড় বড় ময়লা দেখছি। এখন এ জামা কাপড় পরে তো এখানে স্কুলে যেতে পারবে না।

কথা শেষ করেই তিনি সামনের টেবিলে রাখা দু'তিনটে

টেলিফোনের মধ্যে একটা তুলে নিলেন। তারপরে টেলিফোনে বললেন—কে, মায়া? দেখ, আমাদের গ্রামের পরেশের ছেলে এসেছে। এইখানে থেকেই লেখাপড়া করবে। তোমার সুলালেরই বয়সী হবে। দেখ তো সুলালের কোন জামা প্যাণ্ট ওর গায়ে হয় কি না। যদি হয়, ওকে পরিয়ে দাও। আমি ওকে নিয়ে বেরুবো এখন। স্কুলে ভরতি করে দেব। জামা কাপড়ও কিনে দেব। একেবারে পাড়াগাঁয়ের ছেলে। খাইয়েও দিও।

হাতের রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে তিনি বললেন—জটি, ওকে ওপরে দিয়ে এসো।

জটি তাকে লক্ষ্য করে বলে—চল্ রে চল্।

পুলিন দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে লক্ষ্য করে শতদলবাবু বলেন—যা, ওপরে তোর জেঠাইমার কাছে যা, কিছু খেয়ে আয়।

সেই থেকেই শতদলবাবুর সংসারে সে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেল। সুলালের সে ছিল সমবয়সী। কিন্তু সুলাল তার সঙ্গে ততটা মিশতো না। তার সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশেছিল শতদলবাবুর স্ত্রী মায়া আর মেয়ে শর্মিলা।

শতদলবাবুর স্ত্রী মায়া কিন্তু তাকে বিশেষ দেখাশোনা করতে পারতেন না। কারণ তিনি প্রায় নাকি অসুস্থ থাকতেন। বছরের খুব কম সময়ই তিনি ভাল থাকতেন। বেশিরভাগ সময় নিজের মনেই গুম হয়ে বসে থাকতেন। উঠতেন না, কোন কাজেও হাত দিতেন না।

পুলিন মাঝে মাঝে দেখেছে তিনি কেঁদে চলেছেন। এ কান্নার অর্থ শর্মিলাকে সে জিজ্ঞেস করেছিল।

শর্মিলা তার জবাবে বলেছিল—ওইটেই তো মায়ের অসুখ! নিজের মনে কাঁদে। নিজের মনেই বসে থাকে। রাত্তিরে ঘুমোয় না। ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হয়।

থেকেও যাঁর অস্তিত্ব নেই, ঐ বিপুল সংসারের একটা কাজও যিনি করতেন না, তিনি কিন্তু মাঝে মাঝে বড় বেশী করে তাঁর অস্তিত্ব জানাতেন। চেঁচিয়ে বকে সমস্ত বাড়িটাকে যেন মাথায় তুলতেন।

পুলিন তখনও তাঁকে দেখেছে। দূর থেকে দেখলে কেমন যেন ভয় করতো। সকলকার সঙ্গেই কারণে অকারণে তিনি চেঁচামেচি করতেন। তার থেকে অবশ্য পুলিনও বাদ যেত না। তাঁর এই রকম অবস্থা হলে সকলেই সচেতন থাকতো।

মায়ের স্নেহ শর্মিলা পায়নি। ভালভাবে বোঝেওনি সে মা কি জিনিস। কারণ সে বাড়ির ঝি দুর্গার কোলেই মানুষ হয়েছিল। তাই অত লোকজনের মাঝেও সে যেন একটু একা ছিল।

পুলিন আসাতে সে তার জীবনে একজন নতুন সঙ্গী পেয়ে আনন্দে ভরে গেল।

শর্মিলার দাদা দুলাল তখন বিলেতে। ব্যারিস্টারী পাস হয়ে গেছে। কলকাতায় ফিরতে শতদলবাবুই তাকে বারণ করেছিলেন। কারণ জার্মানীর নৌবাহিনী তখন প্রায় বৃটিশের জাহাজ ডুবিয়ে দিচ্ছে।

পুলিন কলকাতায় আসার পরই শুরু হলো পঞ্চাশ সালের মন্বন্তর। সরকার মিলিটারীর জন্য চাল কিনেছিলেন। কিন্তু তা বাজারে ছাড়লেন না। বেয়াল্লিশ সালের বন্যা আর ঝড়ে শস্যের ক্ষতি হলো। তাই পুলিনের গরমের ছুটির আগে থেকেই দলে দলে লোক আসতে লাগলো কলকাতায়।

সে কী মর্মভেদী চিৎকার! "ফ্যান দেবে মা, ফ্যান দেবে?"

সকাল নেই, বিকেল নেই, রাত্তির নেই, সেই কঙ্কালসার মানুষের মুখে হাহাকার ধ্বনি—"খেতে দাও মা, খেতে দাও!"

পুলিন এই সময় নিয়মিতভাবে খবরের কাগজ পড়তো। সে

পড়েছে দেশী কাগজগুলো ইংরেজদের মজুতদার বলে গালাগালি দিয়েছে।

পুলিন দেখেছে খাবারের দোকানের সামনে লোকে না খেতে পেয়ে মরেছে। কিন্তু তারা পেটের জ্বালায় কখনও লুট করেনি।

শতদলবাবু এ ব্যাপারে চুপ করে বসে ছিলেন না। বাড়ির সামনে খোলা মাঠটায় তিনি লঙ্গরখানা খুললেন, বহু লোক সেখানে বারোটা থেকে তিনটে অবধি খেয়ে বাঁচতো।

সে শুনেছিল তাদের দেশেও নাকি এমনি দুর্ভিক্ষ হয়েছে। অনেকে মারা গেছে। শতদলবাবু নাকি সেখানেও মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটির সাহায্যে আর একটা লঙ্গরখানা খুলে তাঁর গ্রামবাসীদের বাঁচাবার চেষ্টা করছেন।

নিয়তই পুলিনের মনে হতো এমনটি কেন হয়?

এমন সময় হঠাৎ একদিন জটি তাকে দেখে বললো—ওরে, তোর সৎমা যে তোকে চিঠি লিখেছে।

সৎমা! অনেকেই তার মানে জিজ্ঞেস করে জটিকে।

বৃদ্ধ ননীবাবু বসে খাতা লিখছিল। সে বলে—হ্যাঁ জটি, পুলিনের কোন মা বেঁচে আছে, এমন কথা তো কোনদিন শুনিনি! শুনেছিলাম পুলিনের কেউ কোথাও নেই।

কথাটায় রসান দিয়ে জটি বললো—এ তেমন মা নয় কাকা! রাতের অন্ধকারে মা হতো। গ্রামে থাকলে না খেতে পেয়ে মরতো। বাঁচলে বড়জোর ঐ বাপের পথ নিত।

কি ভাগ্যি দেখুন! কত্তার নজরে পড়লো। ছোঁড়ার বরাত খুলে গেল। এখন তো এখানে একেবারে লাটসাহেব হয়ে বসেছে। বই খাতা জামা কাপড়ে চেনাই যায় না। মনে হয় যেন কত্তার আর একটা পুষ্যি ছেলে।

এত বাড়াবাড়ি করলে কি সামলাতে পারবে পরে?

একদিন বলতে গিয়েছিলাম। উত্তরে শুনলাম, কর্ত্তা বললেন—জটি, জানো না, দেশের স্কুলে ও ফার্স্ট বয় ছিল। এখানেও ক'মাসের মধ্যে যে পরীক্ষা দিয়েছে তাতে ও প্রথম হয়েছে। ও ছেলে উন্নতি করবেই। ওর মনের মধ্যে অভাব বোধ হলে কিন্তু ও পারবে না।

এই মা কথাটা নিয়ে বিদ্রূপ করাতে পুলিনের অন্তর আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।

কলকাতার এই ক'মাসের জীবনে সে বুঝেছে, শতদলবাবু তাকে যে অনুগ্রহ করেন তা এরা ভাল চোখে দেখে না। তাঁর মহানুভবতাকে এরা বোকামির নামান্তরই মনে করে।

সুলাল তার সঙ্গে মেশে না। বোধ হয় সে বড়লোকের ছেলে বলে। এ বাড়িতে তার হিতৈষী ছিল একমাত্র ঐ শর্মিলা

চিঠিখানা জটিদার হাত থেকে খপ্ করে কেড়ে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর নিজের ঘরে বসে সে সেটাকে পড়তে লাগলো। তাতে লেখা আছে—

বাবা পুলিন,—

কলকাতায় গিয়ে অবধি একখানাও চিঠি দাওনি। আমার ভাবনা হয় না? এখানে বড় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। চালের দাম হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে। ধান ঝাড়ার কাজ একেবারে নেই বললেই হয়। অনেক লোক কলকাতায় পালিয়ে গেছে। যারা জমিদারবাবুর বাড়িতে যায়, তাদের মুখ থেকে শুনেছি তুমি ভাল আছ। মন দিয়ে লেখাপড়া কর। আমার এখন কিছু ভাল লাগে না। নন্দ একরকম না খেতে পেয়ে চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে! পুঁটি, ভোম্বল ভাল আছে। কষ্টে দিন চলে যাচ্ছে। চিঠির জবাব দিও। ইতি—

পুতুল।

ভোম্বল তার চেয়েও দু'বছরের বড়। পুঁটি তার চেয়ে ছোট। নন্দ ছিল তারই বয়সী। ওরা সকলেই পুতুলের ছেলেমেয়ে।

কিন্তু হঠাৎ পুতুলের ওপর একটা বিজাতীয় রাগে তার মনটা ভরে গেল। তার বাবার সঙ্গে তার যে-কোন সম্বন্ধ থাক, তার সঙ্গে কি? তাকে চিঠি দিয়ে সকলের সামনে তার মাথা হেঁট করাবার অর্থ? না, এ চিঠির জবাব সে কিছুতেই দেবে না। পুতুলের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ সে রাখবে না। এখান থেকে কটা বছর পরে সে ম্যাট্রিক পাস করবে। তারপর কোনরকমে আই. এ, বি. এ. পাস করবে। শেষকালে একটা চাকরি নিয়ে সে কোথাও চলে যাবে। দেশে কারুর সঙ্গেই কোন সম্বন্ধ রাখবে না।

মাকে তার মনে পড়ে না। কিন্তু পরিষ্কার মনে আছে পিসিকে। সেই পিসিও শেষকালে যখন অপারগ হয়ে গেল, তখন কেমন যেন হয়ে গেলাম। আর সেই সুযোগে পুতুল ঢুকলো তাদের বাড়িতে। তার বাবার আর পিসির সেবা করবার জন্যে।

তাইতেই তো ওর সাহস বাড়লো। দিনরাত খোকাবাবু আর খোকাবাবু করতে পারলো।

নাঃ, এ জিনিস কখনও সে বরদাস্ত করতে পারবে না।

চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে দিতে বললো, আমার কেউ নেই, আমার কেউ নেই, —বলে অকারণেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

খেলবার জন্যে তাকে ডাকতে এসেছিল শর্মিলা। কিন্তু তার মুখ চোখের অবস্থা দেখে সে চুপ করেই দাঁড়িয়েছিল।

চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে উড়িয়ে দিয়ে সে যখন আমার কেউ নেই বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, তখন শর্মিলা আর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো না।

একটা ভয়ংকর কিছু ঘটেছে বলে সে এগিয়ে গেল পুলিনের

দিকে। জোর করে তার মুখখানা ফ্রকে মুছিয়ে দিতে দিতে সে বললো—কে বললো তোমার কেউ নেই, আমি তো আছি। এত বড় মিথ্যা কথাটা তুমি বলতে পারলে? ছোড়দা না খেলুক, আমি তো খেলবো তোমার সঙ্গে।

শর্মিলার স্নেহস্পর্শে পুলিনের শোকের বেগ যেন আরও বেড়ে উঠলো।

একটু শান্ত হতেই শর্মিলা বললো—তোমায় কে কি বলেছে পুলিন?

—ঐ জটিদা, শুধু শুধু আমায় অপমান করছে।

একটু বিস্মিত হয়ে শর্মিলা বলে—জটিবাবু তোমাকে অপমান করেছে? কিন্তু কেন পুলিন?

পুলিন বলে—এই দেখ না, আমাদের বাড়িতে একটা ঝি ছিল, সে আমাকে চিঠি লিখেছে। তাই বলছে তোর সৎমা চিঠি লিখেছে।

শর্মিলার মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। সে রেগে বলে উঠলো—এ জটিবাবুর ভারী অন্যায়। বাবাকে বলে দিয়ে দেখবে এর ব্যবস্থা কি করি!

পাছে শতদলবাবুর কানে এ কথা যায়, কে জানে তিনি কি মনে করবেন এ বিষয়ে, তাই পুলিন সভয়ে বলে—না না, একথা তাঁকে আর বলতে হবে না।

—কিন্তু জটিবাবু যে তোমাকে এইভাবে অপমান করবে?

পুলিন বললো—Let the dog bark. চল আমরা খেলতে যাই।

আরও তিনটে বছর এই কলকাতাতেই পুলিনের জীবন কেটে গেছে। সে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছে। স্কলারশিপ পাওয়ার দরুন শতদলবাবু খুশী হয়ে তাকে আরও পড়বার সুযোগ দিয়েছেন।

শতদলবাবু তাকে ভরতি করতে চেয়েছিলেন কলকাতার সেরা কলেজ প্রেসিডেন্সীতে। ইচ্ছে করেই সে সেখানে ভরতি হয়নি। ভরতি হয়েছিল রিপন কলেজে।

শর্মিলার সঙ্গে আজও তার তেমনি বন্ধুত্ব অটুটই আছে। কৈশোরের স্নেহ আর নেই। আজ তা রূপান্তরিত হয়েছে প্রেমে।

ওরা দুজনেই ভাবে পরস্পরকে তারা ভালবাসে।

দুলাল ফিরে এসেছে বিলেত থেকে। তবে একা নয়। সঙ্গে মেমসাহেব। সংসারে সে কিছুই দেখে না বা করে না। তাই তাদের প্রেমে বাধাও পড়েনি।

বাড়িটার পেছন দিকে খানিকটা জায়গা পড়ে ছিল। সেখানে আগে বাগান ছিল। সেইখানেই মেমসাহেবকে নিয়ে দুলালের থাকবার জায়গা হয়েছে।

সে এখন কলকাতার হাইকোর্টে যাতায়াত করে।

শতদলবাবু যখন দুলালের এই মেম বিয়ে করার কথা জানতে পেরেছিলেন, প্রথমটা আঘাত পেলেও পরমুহূর্তে নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছিলেন।

দুলালকে বিলেতে তিনি চিঠি দিয়েছিলেন—ইনেট বলে যে মেয়েটিকে তুমি বিয়ে করেছ, তাকে নিয়েই তুমি কলকাতায় এস। শুনেছি বিলেতে নাকি আমাদের বাঙালীরা যাদের বিয়ে করে তারা খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে নয়। ওরা নাকি কেবল পয়সার জন্যে ইণ্ডিয়ার ছেলেদের বিয়ে করে। তার কারণ ওদের ধারণা ইণ্ডিয়ান মাত্রই প্রিন্স। এ মেয়েটি কেমন ঘরের? চিঠিতে জানিয়ো। যাই হোক, তুমি যখন তাকে বিয়েই করে ফেলেছ, তখন তাকে আমি ঘরে নেব, বাধা দেব না। কারণ তুমি জান, তোমাদের মাকে নিয়ে আমি সুখী হইনি। আমিই

তোমাদের মা-বাপ দুই ছিলাম। তোমরা যা পেলে সুখী হবে তাতে আমারও আনন্দ। তোমার মা আগের মতনই আছেন, চিকিৎসাতেও বিশেষ পরিবর্তন কিছুই হয়নি। প্রয়োজন বুঝলে বিলেতের ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে পার। কলকাতায় তাঁরা যদি কেউ আসতে রাজী হন, তাহলে কথা বল, কারণ ওকে সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে চিকিৎসায় বিশেষ সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। আশীর্বাদ জেন। শীগ্‌গির ফেরবার ব্যবস্থা কর। ইতি—

তোমার বাবা।

এর পরেই দুলাল মেমসাহেবকে নিয়েই কলকাতায় ফিরেছিল। তার আগেই শতদলবাবু সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন বলেই কারো কোন অসুবিধা হয়নি। যাক সে কথা। বাড়ির সরকার আর আমলাদের কথা শুনে শুনে পুলিনের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, শতদলবাবু তাকে যতই স্নেহ করুন, লোকে তাকে এ বাড়ির পরগাছাই বলবে। শতদলবাবু দাতা আর সে গ্রহীতা। উপায় নেই। কোনরকমভাবে রোজগার করার সময় না আসা অবধি তাকে মুখ বুজে এ অপমান সহ্য করতেই হবে। পরে পারলে সে শতদলবাবুর সব দেনা রোজগার করে শোধ দেবে। তখন ঐ জটি, ননী, কেষ্টার মুখখানা কেমন হবে তা কল্পনা করে আনন্দে তার মন ভরে যেত। ম্যাট্রিক পাস করেই একবার সে ভেবেছিল এ বাড়ির সংস্রব সে ছেড়ে দেবে। এখানে আর সে থাকবে না। টিউশানি করেই সে তার পড়াশোনা চালাবে। কিন্তু এতে বাধা দিয়েছিল শর্মিলা। সে তখন লরেটো স্কুলের প্রায় শেষ ধাপে পৌঁছেছে।

শর্মিলা তার এই সংকল্পের কথা শুনে বলেছিল—পুলিন তুমি চলে যাবে আমাকে ছেড়ে? পারবে তুমি আমায় ছেড়ে থাকতে?

পুলিন বলে—উপায় কি শর্মিলা? তোমরা বড়লোক। কতদিন আর এভাবে তোমাদের সাহায্য নেব?

শর্মিলা বলে—না না, সাহায্য বলে ভাবছ কেন? বাবা যদি ঘরজামাই রাখতেন, তাহলে তো তার সব খরচও দিতে হতো।

পুলিন তবু বলে—আমি ঘরজামাই হতেই বা যাব কেন?

তার মুখে একটা চুমা দিয়ে শর্মিলা বললো—আচ্ছা, মশাই আচ্ছা। তোমাকে ঘরজামাই হতে আর হবে না। আমাকে বিয়ে করার পর তুমি বাবার সব টাকা ফেরত দিয়ে দিও। কিন্তু ততদিন তুমি আমার কাছে থাক।

পুলিন হাসতে হাসতে বলে—আচ্ছা।

এইভাবেই পুলিনের তখন থেকেই স্বাধীনভাবে থাকার কল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল।

'৪৬ সালের ১৬ই অগস্ট মুসলিম লীগের রাজত্বে হঠাৎ শুরু হলো হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। রাজপথ রক্তে লাল হলো। পৈশাচিক হত্যার উল্লাসে তারা যেন মেতে উঠলো। থানায় সাহায্য চাইলে তা পাওয়া যেত না। শোনা গেল, মুখ্যমন্ত্রী হাসান সুরাবর্দী সাহেব নাকি নিজে লালবাজারে কণ্ট্রোল রুমে থেকে পুলিসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন নিষ্ক্রিয় থাকতে। কিন্তু পাড়ার ছেলেরা নিষ্ক্রিয় রইলো না। তারা জোট বাঁধলো। টর্চ আর লাঠি হাতে করে সতর্ক দৃষ্টিতে তারা পাড়া পাহারা দিতে লাগলো। পুলিনও উত্তেজনার বশে পাড়ার রক্ষিবাহিনীতে যোগ দিতে গিয়েছিল, কিন্তু শর্মিলা তাকে দিতে দেয়নি। কেঁদে সে বলেছিল—তুমি যদি ও কাজে লাগ, তবে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো। নইলে সারারাত আমি ঘুমুতে পারবো না।

শর্মিলার একান্ত অনুরোধেই সেদিন পুলিন ক্ষান্ত হয়েছিল সেই রক্ষিবাহিনীতে যোগ দেওয়া থেকে। প্রথমে সারা বাংলা, তার পরে বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো এই সাম্প্রদায়িক আগুন। দেশবাসী হলো জর্জরিত। সকলেই বলে—এর প্রতিকার চাই। এমনি সময় তখনকার বড়লাট বাহাদুর ভাইকাউন্ট মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন: "ইংরেজ ভারত ছেড়ে যাবে। তার আগে এই সাম্প্রদায়িক আগুন থামাবার জন্যে দেশ বিভাগ করা দরকার।"

রাজী হয়ে গেলেন হিন্দু-মুসলমানের প্রতিনিধিস্থানীয় সকলে। রাজী হননি কেবল ঐ ছোট্ট কাপড় পরা, হাতে লাঠি ধরা মহাত্মা গান্ধী। পুলিন তাঁর অহিংসা-নীতি বুঝতো না, তাই তার সে নীতির ওপর আস্থাও ছিল না কোন দিন। সে ভাবতো গান্ধীজি দুর্বল—বোকা। যাদের চোখ রাঙ্গিয়ে শাসন করা দরকার, তাদের তিনি রামধুন গেয়ে, প্রেমের কথা শুনিয়ে সংশোধন করতে চাচ্ছেন। এতে কি হবে? কিন্তু তার ভাবাতে কিছু এসে গেল না।

দেশের নেতারা দেশ বিভাগ করলেন। সৃষ্টি হলো পাকিস্তান আর ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন।

বিলেত থেকে ফিরেই দুলাল তাদের দেশ থেকে আইন-সভার সদস্যরূপে মনোনীত হয়েছিল। পুলিনকে সেখানে গিয়ে খাটবার জন্যেও সকলে বলেছিল। পুলিন যায়নি। তার কারণ, সামনে তার পরীক্ষা ছিল।

দুলাল যেদিন প্রথম আইনসভার সদস্য নিযুক্ত হয়, সেদিন দেশ থেকে অনেকেই এসেছিল তাকে অভিনন্দন জানাতে। পুলিনের দুলালকে না দেখতে পারবার আর একটা কারণ ছিল। সে কারণ হচ্ছে পুলিনের এ বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করার দরুন শতদলবাবুর

কাছে দুলাল আপত্তি জানিয়েছিল। শতদলবাবু অবশ্য সে কথা কানে তোলেননি।

জবাবে তিনি বলেছিলেন—বাড়ির লোকজন, দাসদাসী মিলিয়ে প্রায় তিরিশ চল্লিশ জন লোক আছে। তার সঙ্গে যদি আর একটা লোক থাকে তাতে এমন কিছু খরচ বাড়ে না।

স্কুলে ও ফ্রী পড়েছে। ম্যাট্রিকুলেশনেও জলপানি পেয়েছে। সুতরাং স্টেটের টাকা ওর জন্যে খরচা হয়নি। খরচ হয়েছে ওর জামা-কাপড় আর বই কেনাতে। সামান্য ক'টা টাকা, তাতে যদি ও ছেলেটা মানুষ হয়ে উঠতে পারে, তাতে দেশের ভালই হবে। টাকা তো সঙ্গে যাবে না। কিন্তু মানুষের শুভ ইচ্ছা সঙ্গে যায়। আর তাইতেই তার আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।

দুলালের এর পর আর কথা বলা চলে না। সে জানতো তার বাবাকে। আরও শুনেছিল পরেশের মৃত্যুকালে তার বাপের কথা দেওয়ার গল্প। তাই এ ব্যাপারে আর সে এগোতে সাহস করেনি।

তবু সে বলেছিল—শর্মিলা বড় হয়েছে। এ অবস্থায় পুলিনের কি বাড়ির ভেতরে বার বার যাওয়া ভাল যদি তার ভালমন্দ একটা কিছু হয়!

শতদলবাবু হাতের চুরুটে একটা টান দিয়ে বললেন—মানুষের স্বাধীন ইচ্ছেকে দাবিয়ে রাখা যায় না। তাছাড়া আমি তোমাদের তিন ভাই বোনকেই শিখিয়েছি স্বাধীন মতামত নিতে। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ বিচার করতে। তাতে আমি তো বাধা দিতে পারি না! তাছাড়া অ্যারিস্টোক্রেসি বলতে আজকে তোমরা যা বোঝ আমি ঠিক তা বুঝি না।

দেখ, আমি গ্রামের ছেলে। তাছাড়া আমার বাবাও ছিলেন ওদেরই একজন। তাই এসব ব্যাপারে আমি কোন কথা বলতে চাই না।

তোমার বোন লরেটো স্কুলে পড়ে মেমসাহেবদের সঙ্গে মানুষ হচ্ছে। তাকে তুমি ঘরের কোণে বন্দী করবে কি করে ?

এই নিঃসঙ্গতা যে কি জিনিস তা আমি বুঝেছি।

এর পরে দুলালের আর কোন কথাই বলা চলে না। তাই— "করুন আপনার যা ইচ্ছে" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

কথাবার্তাগুলো কেষ্ট আর একজন নায়েব পাশের ঘর থেকে সব শুনেছিল। সেই এসে খবর দিয়েছিল পুলিনকে।

তখন থেকেই পুলিন বাড়ির ভেতর যাওয়া বন্ধ করলো। প্রাণপণ চেষ্টায় মন দিল লেখাপড়ার মধ্যে ডুবে যেতে।

তবে রাত্রে শর্মিলার সঙ্গে তার দেখা হতো। সে লুকিয়ে আসতো তার সঙ্গে দেখা করতে।

পুলিন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। ইংরেজী অনার্স নিয়ে সে বি. এ. ক্লাসে ভরতি হলো।

একদিন কলেজের বারান্দায় যখন সে দাঁড়িয়ে, তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল অলকেশের।

এই পরিচয়ের ঘটনাটা সামান্য হলেও পুলিনের জীবনে ঘটে গেল আর এক অধ্যায়।

ব্যাপারটা হয়েছিল কি, সেদিনকার খবরের কাগজ নিয়ে শুরু হয়েছিল কথাবার্তা।

তেভাগা আন্দোলন। "হাল যার ফসল তার।"

পুলিন প্রথমটা কথায় যোগ দেয়নি। কয়েকজন ছেলে হঠাৎ বলে উঠেছিল—এ অন্যায়। যারা এই কাজ করছে তারা দেশের শত্রু

যারা হাল নিয়ে মাঠে চাষ করবে তারা যদি সমস্ত ফসলটা দাবি করে, তাতে জমির মালিক কি পাবে ?

তাছাড়া এই সমস্ত লোকেরা, যারা কিছুই জানে না, তারা ফসল বিক্রি করে টাকাটা নষ্ট করবে। তাহলে দেশের উন্নতিটা হবে কি করে?

অলকেশ প্রতিবাদের স্বরে তীব্রকণ্ঠে বলে—যারা গায়ের রক্ত জল করে ফসল জন্মাবে তারা পাবে মাত্র সামান্য দিনমজুরি? তারপর ফসল কাটা হয়ে গেলে তারা মরবে উপবাসে? এই বা কেমন কথা?

বরেন টিপ্পনী কেটে বললো—মজুরি যা তারা পাবে তার থেকে তারা জমায় না কেন? তাহলে তো পরে আর উপবাস করতে হয় না।

অলকেশ একটা বিদ্রূপের কটাক্ষ হেনে তাকে বললো—তুমি বড়লোকের ছেলে, আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে শিয়ালদহে কলেজে আস, পায়ে হেঁটে নয়, বাপের মোটর গাড়ি চড়ে। একবার ভেবে দেখেছো কি, তুমি বিলাসে যে টাকাটা খরচ করছো সেটা আসছে কোথা থেকে, যোগাচ্ছে কে?

উত্তরে বরেন বলে—কেন, আমার বাবা। তুমি যোগাচ্ছ না নিশ্চয়ই।

অলকেশ বলে—না। সে টাকা তোমার বাবা যোগাননি। যোগাচ্ছে তোমাদের কারখানার শ্রমিকরা। কি মাইনে দাও তাদের? অথচ বিলাসের উপকরণগুলো তারাই তোমাদের যুগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তুমি যে এগুলোকে ভোগ করছো, তা কোন্ অধিকারে?

—জন্মের অধিকারে। তারাও তো আমার বাবার ছেলেমেয়ে হয়ে জন্মাতে পারতো, জন্মায়নি কেন?

অলকেশ বলে—True word of capitalist. আজকে পড়ছো, না পড়লেও ক্ষতি ছিল না। টাকার গদিতে বসে আছো,

ভাবছো চোখ রাঙিয়ে আর লাথি মেরেই তোমাদের দিনগুলি যাবে। কিন্তু তা যাবে না বন্ধু! ওদিকে রাশিয়া আর এদিকে চীন। ম্যাপটা একবার খুলে দেখেছো, লাল হয়ে গেছে। এবার তোমাদেরও লাল হতে হবে। একবার ভেবে দেখেছ কি তোমার বাবা কতটুকু পরিশ্রম করেন এই টাকার জন্যে? যদি কোম্পানিতে একবার স্ট্রাইক বাধে, যদি সব মেসিনগুলো তোমাদের নিজেদের চালাতে হয়, তাহলেই বুঝবে কতখানি কষ্ট এর জন্য হয়। হয়তো পারবেও না কোম্পানির প্রোডাকশান ঠিক রাখতে। কিন্তু যারা গায়ের রক্ত জল করে তোমাদের মত মুনফাবাজদের সাহায্য করলো তারা কিছু পেল না, পাবে তোমরা, তোমাদের বংশধরেরা। সব চেয়ে মজা হচ্ছে, তাদের প্রাপ্য ভাগ তোমরা কেড়েও নিলে আবার চোখও রাঙালে। চমৎকার! I hate you. তোমরা মানুষ না অন্য কিছু!

বলতে বলতে অলকেশের চোখদুটো হিংস্র হয়ে উঠলো।

পুলিনের মনে হলো অলকেশের কথাগুলি তো সত্যি! ঐ দুলাল বা সুলাল, পূর্বপুরুষের জমিদারির জন্যেই আজ সমাজের মাথার ওপরে বসে আছে। সুলাল দু'দুবার ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করা সত্ত্বেও, আজ তার বাবার ফ্যাকটরীর মালিক হয়ে বসেছে।

দুলালদার ভাল রোজগার না হওয়া সত্ত্বেও তিনি আজ দেশনেতা।

কিন্তু অলকেশ এ সমস্ত কথা জানলো কি করে? তাই সে সেই দিন থেকেই অলকেশের একজন মুগ্ধ ভক্ত হয়ে গেল।

তখনই তার সঙ্গে পরিচয় হয় ঐ প্রহ্লাদদার সঙ্গে। বেঁটেখাটো লোক, চোখের দৃষ্টি যেন মনে হয় অন্তর্ভেদী। তার আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বলেছিলেন—তুমি পারবে এই পার্টির কাজ করতে? যদি জেলে যেতে হয়?

পুলিন বলে—তাতে আমি ভয় পাই না।

—যদি তোমার অত্যন্ত প্রিয়জনের ক্ষতিসাধন করতে হয়?

পুলিন বলে—আমার তো কেউ নেই।

প্রহ্লাদদা বলেন—That's all right. মনে রেখ গান্ধীজী বা কংগ্রেসের মত আমাদের নীতি অহিংস নয়। আমাদের পথ বাঁকা। শ্রমিকদের রক্তে পিচ্ছিল। ওদের মুক্তিসাধন আমাদের করতে হবে। এর জন্যে যদি—

পুলিন বলে—আমি বুঝেছি, তার জন্যে আমি প্রস্তুত।

—All right. মনে রেখ রাশিয়াতে একসময় Volga river was choked up with dead bodies—অর্থাৎ ভল্‌গা নদীর স্রোত মৃতদেহে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কবে গঙ্গা নদীর স্রোত এই সমস্ত দেশের পুঁজিবাদীদের রক্তে লাল হবে তা কে জানে!

সেই দিন থেকেই পুলিন হলো পার্টির সদস্য। প্রচুর বিদেশী বইও সে অফিস থেকেই পেত পড়বার জন্যে। এবং প্রচারপত্র হাতে নিয়ে তাদের দলের আদর্শ বোঝাবার চেষ্টা করতো।

দিন কেটে যাচ্ছে এইভাবেই। সে অনার্স পেল। শুধু অনার্স নয় সে একেবারে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করলো।

শতদলবাবু তাকে আশীর্বাদ করে বললেন—ভগবানের দয়ায় তুমি বি. এ. পাস করলে। এবার কি করবে ভাবছো?

পুলিন বলে—আমি ভাবছিলাম, আপনি তো অনেক দিনই খাওয়ালেন, এইবার নিজে একটা কাজকর্ম দেখি।

শতদলবাবু প্রশ্ন করেন—এম. এ. পড়বে না? তোমার মত ব্রিলিয়ান্ট বয় যদি টাকা টাকা করে, তাহলে কি দেশের উন্নতি হবে? না না—এ হতে পারে না! তুমি স্কলারশিপের টাকা পেয়েছো। এম. এ পড়তে তোমার খরচ লাগবে না। তোমাকে এম. এ. টা পড়তেই হবে।

পুলিন বলে—বেশ, আপনার কথাই থাকবে। আমি রাত্তিরে এম. এ. পড়ব। দিনের বেলাটায় আমায় এবার কাজ করতে দিন।

শতদলবাবুর সুপারিশেই সে ভাল একটা সদরের অফিসে চাকরি পায়। W. B. C. S. পরীক্ষা বা I. A. S. পরীক্ষা দিতে শতদলবাবু তাকে বলেছিলেন। কিন্তু সে কাজ সে নিতে রাজী হয়নি। তাতে পার্টির কাজে অসুবিধা হবে।

ব্যাপারটা বেশ সুষ্ঠ‌ুভাবেই চলছিল। যত গোল বাধালো শর্মিলা।

সে একদিন এসে তাকে বললো—তুমি রোজগার করছো, এইবার বাবাকে বলে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থাটা করো।

পুলিন বলে—আমি বলব কি করে? তার চেয়ে তুমি বল।

শর্মিলা বলে—বা রে! তুমি পুরুষমানুষ। তুমি পারবে না তো পারবে কে? তাছাড়া এখানে দাদা আমাকে প্রায় পার্টিতে নিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে বহু বড়লোকের ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন। তারপর কি জানি,—

পুলিন বলে—ভালই তো, বড়লোকের ছেলের বউ হবে।

শর্মিলার দৃষ্টি এবার প্রখর হলো। তারপরে সে বললো—বা রে! ছেলেবয়েস থেকে তোমাকে স্বামী বলে জানি! আজ কি অন্য লোককে স্বামী ভাবতে পারি? তাছাড়া আমি তো কখনও নিজেকে বড়লোকের স্ত্রী বলে তৈরী করিনি। আমি নিজেকে তৈরি করেছি গরীবের স্ত্রী হবো বলে। তোমার আয়েতে যদি সংসার না চলে তাহলে আমি তখন কাজে বেরুবো। তারপর দাদাতে বাবাতে সেদিন কথা হচ্ছিল, ওঁরা এইবার ঘটক লাগাবেন আমার বিয়ের জন্যে। এইবার লক্ষ্মীটি, বাবাকে বল। আমি জানি তোমার হাতে আমাকে তুলে দিতে বাবার অমত হবে না।

পুলিন বলে—কিন্তু তোমার দাদা কি রাজী হবে?

—দাদা বাবার ওপর কোন কথা বলতে পারবে না, আর বললেও তা টিঁকবে না। কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বল তো? এতদিন আশা দিয়ে তুমি আবার অন্য কথা বলছ কেন?

পুলিন বলে—দেখ, আমি অন্য পথ পেয়েছি জীবনে। তোমার বরঞ্চ ঐ বড়লোক ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে হওয়াই ভাল।

শর্মিলা দু'হাত দিয়ে পুলিনের গলা জড়িয়ে ধরে। তারপরে তার বুকের ওপর মুখ রেখে শিশুর মতন ফুঁপিয়ে উঠে বলে—না না, তুমি আমাকে অপরের হাতে দিও না। তোমার পথই আমার পথ। আমি ভিন্ন পথ জানি না। জানতে চাই না।

পুলিন এবার বলে—কিন্তু শর্মিলা, এ যে বড় কঠোর দুঃখের জীবন। এর মধ্যে—

শর্মিলা বলে—তুমি কি অন্য কোন মেয়েকে ভালবেসেছো? তা যদি বাস তাহলে দ্বিধা কর না, আমাকে বলো, তোমার সুখের পথে আমি কাঁটা হব না। আর কেবল যদি আমি জমিদারের মেয়ে বলে তুমি পিছিয়ে যাও, তবে পিছুতে তোমায় দেব না। এ ব্যাপারের একটা শেষ হওয়া দরকার।

পুলিন বলে—বেশ। আমি ভীরু নই শর্মিলা। আমি তোমার বাবাকে বলবো তারপর তিনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।

সে রাত্রে বিছানায় শুয়ে পুলিনের ঘুম আসতে চাইলো না। শর্মিলাকে একান্ত করে পাওয়ার সুপ্ত বাসনা তার মনের মধ্যে আবার জেগে উঠলো। শর্মিলার অঙ্গস্পর্শে একটা নতুন চিন্তাধারা তার মনে উদয় হলো।

শর্মিলা কি কেবল বড়লোকের সঙ্গিনী হবে? সে গরীব বলে তার কি কোন দাবিই নেই শর্মিলার ওপর?

সে তো শর্মিলাকে শুধু শুধু ভোগ করতে চায় না! ন্যায্য সম্মান দিয়ে বিয়েই করতে চায়। পাত্র হিসেবে সে কি খারাপ?

নাইবা রইলো তার পয়সা। তার বিদ্যে আছে, বুদ্ধি আছে, খাটবার শক্তি আছে। তবে শর্মিলার মত মেয়ে তার কাছে অস্পৃশ্য হবে কেন?

দুলালদা, সে শুনেছে, গ্রামের গরীবের দুঃখে কেঁদেছে। সে নাকি বলেছিল, অবশ্য বিধানসভার সদস্য হবার সময়, তার কাছে সব গ্রামবাসীই সমান।

শতদলবাবুও তাকে দয়া দেখিয়ে, গ্রামের লোকদের কাছে একটা দেবতার আসন নিয়েছেন। এইবার তার সত্যিকারের প্রমাণ হবে।

যদি শতদলবাবু তার সঙ্গে শর্মিলার বিয়ে দিতে রাজী হন, তাহলে সে বুঝবে তাদের মধ্যে সততা আছে।

পার্টির অফিস থেকে সে এতদিন যা শুনেছিল তা সব ভুল, সব মিথ্যে। ছেড়ে দেবে সে ও-পথ। ফিরে যাবে তার সেই পুরানো জীবনে। কিন্তু ওরা যদি না রাজী হয় তাহলে? তাহলে সে বুঝবে, পার্টির কথাই ঠিক। ওরা মানুষের উপকার করে নিজেদের স্বার্থের খাতিরে। স্বার্থ ছাড়া ওরা এক পা-ও চলে না।

এমনি সময় তার মনে পড়ে গেল একটা কথা। এটা হচ্ছে মানুষের জীবনের অগ্নিপরীক্ষা। স্বার্থে আঘাত পড়লেই মানুষকে তখনই চেনা যায়।

অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোকও তখন রুদ্রমূর্তি ধরে। দেখা যাক এঁদের সততার খোলসের নীচে কি আছে।

শর্মিলার জন্যেও না হোক, ওদের প্রকৃত রূপ চেনবার জন্যেও শর্মিলার সঙ্গে বিয়ের কথা তাকে জানাতেই হবে শতদলবাবুকে।

কিন্তু কি করে বলা যায়? মুখে? নাঃ সেটা ঠিক সে পারবে না। তার চেয়ে বরং একটা চিঠির মাধ্যমে সে সব জানাবে।

যদি ওরা শর্মিলার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী না হয় তাহলে কালই সে ঐ বাড়ি ছেড়ে দেবে।

যারা মানুষে মানুষে এতখানি ভেদাভেদ সৃষ্টি করে তাদের সংস্পর্শ সে রাখবে না। দিক তুলে ওরা শর্মিলাকে বিলেতফেরত কোন মন্তপের হাতে, তাতে সে আপত্তি করবে না। তারপরে শর্মিলার ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটুক। তার দায়িত্ব সব শেষ হয়ে যাবে।

উত্তপ্ত মস্তিষ্কে সে উঠে বসলো ঘরের আলো জেলে। কাগজ কলম নিয়ে সে শতদলবাবুকে একখানা চিটি লিখতে বসলো।

অনেকবার ছিঁড়ে সে এই কথাগুলি লিখলো—

শ্রদ্ধেয় জেঠামশাই,

আজ ক'দিন ধরেই আপনাকে একটা কথা জানানো দরকার মনে করছি। আমি এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছি। রোজগারও করছি। এখন আমি ভাবছি আপনাদের অনুগ্রহে না থেকে নিজেই সংসার আরম্ভ করব। কিন্তু একা তো সংসার পাতা যায় না। ঘরের জন্য গৃহিণীর প্রয়োজন। ছেলেবয়েস থেকেই শর্মিলাকে আমি জানি। আমরা খেলাচ্ছলেই পরস্পরকে ভালবেসেছিলাম। আজও আমাদের সেই ভালবাসা অটুট আছে। শর্মিলার মুখে শুনলাম, আপনারা ওর বিয়ের ব্যবস্থা করছেন। তাই তাড়াতাড়ি এই চিঠি আপনাকে লিখতে হলো। পাত্র হিসেবে যদি আপনি আমাকে মনোনীত করেন, তাহলে আমি যথাযোগ্য নিয়মে শর্মিলাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছি। আমাকে আপনি অনেকবার বলেছেন, তুমি বুদ্ধিমান এবং লেখাপড়ায় ভাল। সে কথা আমি বিশ্বাস করেছি। আমার স্থির বিশ্বাস আমি জীবনে উন্নতি করবই। তবে আমি যদি শর্মিলাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে

পাই, তাহলে আমার জীবনের চলার পথ আরও সুগম হবে। আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। অধিক আর কি লিখিব? আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। ইতি—

পুলিন।

চিঠি শেষ করে সে বার বার সেটাকে পড়ে। তারপরে খামেতে শতদলবাবুর নাম লিখে সে আবার শুয়ে পড়ে বিছানায়।

কোন একটা ঘড়িতে তখন রাত চারটে বাজার সংকেত দিল।

চোখ বুজে সে ঘুমোবার চেষ্টা করে। তার তখন ঘুম আসতে চায় না। তখন তার মনে হয় বিদেশী এক অর্থনীতিকের কথা—"To each according to his needs"—অর্থাৎ যার যা প্রয়োজন সে তাই পাবে।

শর্মিলাকে তার জীবনে প্রয়োজন। সে পাবে না-ই বা কেন? তাকে পেতেই হবে। এতে ভুল তার কোথাও হয় নি।

নিত্যকার মত দিন শুরু হলো। পুলিন সেদিন একটু বেলা করেই বিছানা ছাড়লো। মুখ হাত ধুয়ে চা খাবার সময় সে খবর নিল শতদলবাবু নেমেছেন কিনা। দেখে, তিনি তখনও নামেননি।

খেয়ে দেয়ে অফিস যাবার সময় সে দেখে শতদলবাবু নেমেছেন। মুখটা তাঁর শুকনো। একটা ঘটকজাতীয় লোকের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন। ভবানীপুরের পড়েযাওয়া এক জমিদারের ছেলের কথাই ঘটকটি বলছিল।

পুলিন ঘরের মধ্যে ঢোকে। শতদলবাবু বলেন—এই যে পুলিন ক'দিন দেখিনি কেন তোমায়? শরীর ভাল আছে তো? তোমাদের কাজকর্মই বা কেমন হচ্ছে?

পুলিন বলে—আজ্ঞে, ভালই।

শতদলবাবু বলেন—দেখ শর্মিলার বিয়ের চেষ্টা করছি, যদি ভগবানের দয়ায় লেগে যায় তাহলে থাকতে থাকতে তার বিয়েটা দিয়ে যেতে পারি। নইলে বুঝেছো তো কে বিয়ে দেবে, আমার ভরসা তোমরা পাঁচজনে আছ।

পুলিন চুপ করে থাকে, কথার জবাব দেয় না।

তারপরে ধীর পদবিক্ষেপ করে বলে—আমি বেরুই, আমার অফিস আছে।

শর্মিলা বলে—বা রে! তুমি পুরুষমানুষ। তুমি পারবে না তো পারবে কে? তাছাড়া এখানে দাদা আমাকে প্রায় পার্টিতে নিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে বহু বড়লোকের ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন। তারপর কি জানি,—

পুলিন বলে—ভালই তো, বড়লোকের ছেলের বউ হবে।

শর্মিলার দৃষ্টি এবার প্রখর হলো। তারপরে সে বললো—বা রে! ছেলেবয়েস থেকে তোমাকে স্বামী বলে জানি। আজ কি অন্য লোককে স্বামী ভাবতে পারি? তাছাড়া আমি তো কখনও নিজেকে বড়লোকের স্ত্রী বলে তৈরি করিনি। আমি নিজেকে তৈরি করেছি গরিবের স্ত্রী হবো বলে। তোমার আয়েতে যদি সংসার না চলে তাহলে আমি তখন কাজে বেরুবো। তারপর দাদাতে বাবাতে সেদিন কথা হচ্ছিল, ওঁরা এইবার ঘটক লাগাবেন আমার বিয়ের জন্যে। এইবার লক্ষ্মীটি, বাবাকে বল। আমি জানি তোমার হাতে আমাকে তুলে দিতে বাবার অমত হবে না।

পুলিন বলে—কিন্তু তোমার দাদা কি রাজী হবে?

—দাদা বাবার ওপর কোন কথা বলতে পারবে না, আর বললেও তা টিকবে না। কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বল তো? এতদিন আশা দিয়ে তুমি আবার অন্য কথা বলছ কেন?

পুলিন বলে—দেখ, আমি অন্য পথ ধরেছি জীবনে। তোমার বরঞ্চ ঐ বড়লোক ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে হওয়াই ভাল।

শর্মিলা দুহাত দিয়ে পুলিনের গলা জড়িয়ে ধরে। তারপরে তার বুকের ওপর মুখ রেখে শিশুর মতন ফুঁপিয়ে উঠে বলে—না না, তুমি আমাকে অপরের হাতে দিও না। তোমার পথই আমার পথ। আমি ভিন্ন পথ জানি না। জানতে চাই না।

পুলিন এবার বলে—কিন্তু শর্মিলা, এ যে বড় কঠোর দুঃখের জীবন। এর মধ্যে—

শর্মিলা বলে—তুমি কি অন্য কোন মেয়েকে ভাল বেসেছো? তা যদি বাস তাহলে দ্বিধা কর না, আমাকে বলো, তোমার সুখের পথে আমি কাঁটা হব না। আর কেবল যদি আমি জমিদারের মেয়ে বলে তুমি পিছিয়ে যাও, তবে পিছুতে তোমায় দেব না। এ ব্যাপারের একটা শেষ হওয়া দরকার।

পুলিন বলে—বেশ। আমি ভীরু নই শর্মিলা। আমি তোমার বাবাকে বলবো তারপর তিনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।

সে রাত্রে বিছানায় শুয়ে পুলিনের ঘুম আসতে চাইলো না। শর্মিলাকে একান্ত করে পাওয়ার সুপ্ত বাসনা তার মনের মধ্যে আবার জেগে উঠলো। শর্মিলার অঙ্গস্পর্শে একটা নতুন চিন্তাধারা তার মনে উদয় হলো।

শর্মিলা কি কেবল বড়লোকের সঙ্গিনী হবে? সে গরিব বলে তার কি কোন দাবিই নেই শর্মিলার ওপর?

সে তো শর্মিলাকে শুধু শুধু ভোগ করতে চায় না! ন্যায্য সম্মান দিয়ে বিয়েই করতে চায়। পাত্র হিসেবে সে কি খারাপ? নাই বা রইলো তার পয়সা। তার বিদ্যে আছে, বুদ্ধি আছে, খাটবার শক্তি আছে। তবে শর্মিলার মত মেয়ে তার কাছে অস্পৃশ্য হবে কেন?

দুলালদা, সে শুনেছে, গ্রামের গরিবের দুঃখে কেঁদেছে। সে নাকি বলেছিল, অবশ্য বিধানসভার সদস্য হবার সময়, তার কাছে সব গ্রামবাসীই সমান।

শতদলবাবুও তাকে দয়া দেখিয়ে, গ্রামের লোকদের কাছে, একটা দেবতার আসন নিয়েছেন। এইবার তার সত্যিকারের প্রমাণ হবে।

যদি শতদলবাবু তার সঙ্গে শর্মিলার বিয়ে দিতে রাজী হন, তাহলে সে বুঝবে তাদের মধ্যে সততা আছে।

পার্টির অফিস থেকে সে এতদিন যা শুনেছিল তা সব ভুল, সব মিথ্যে। ছেড়ে দেবে সে ও-পথ। ফিরে যাবে তার সেই পুরানো জীবনে। কিন্তু ওরা যদি না রাজী হয় তাহলে? তাহলে সে বুঝবে পার্টির কথাই ঠিক। ওরা মানুষের উপকার করে নিজেদের স্বার্থের খাতিরে। স্বার্থ ছাড়া ওরা এক পা-ও চলে না।

এমনি সময় তার মনে পড়ে গেল একটা কথা। এটা হচ্ছে মানুষের জীবনের অগ্নিপরীক্ষা। স্বার্থে আঘাত পড়লেই মানুষকে তখনই চেনা যায়।

অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোকও তখন রুদ্রমূর্তি ধরে। দেখা যাক এঁদের সততার খোলসের নীচে কি আছে।

শতদলবাবু বলেন—আচ্ছা বেশ।

পুলিন এবার কথা বলার সুযোগ পেয়ে বলে—শর্মিলার বিয়ের সম্বন্ধে আমিও ভাবছিলাম, একটা পাত্র—

উৎসাহিত হয়ে শতদলবাবু বলেন—নিশ্চয়ই ভাববে বৈইকি বাবা! এ তো তোমাদেরও কাজ। ছেলেটি কি করে, কাদের বাড়ির ছেলে? স্বভাবচরিত্রই বা কেমন?

সন্তর্পণে পকেট থেকে খামটা বার করে তাঁর হাতে দিয়ে বলে—আজ্ঞে, আমি সব খবরই এতে লিখে রেখেছি। আপনি এখন পড়ে দেখুন, আপনার পছন্দ হয় কি না।

উৎসাহিত হয়েই শতদলবাবু খামটা নিতে নিতে বলেন—আরে তোমার যখন পছন্দ হয়েছে তখন আর আমার আপত্তি কোথায়?

পুলিন তাড়াতাড়ি বলে—আচ্ছা আপনি দেখুন, আমি অফিস যাই।—বলে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

সারাদিন তার অফিসে মনে হয়, চিঠি পেয়ে শতদলবাবুর মুখের অবস্থা কেমন হয়েছিল। কি তার ভাগ্যে আছে! কাজে সে মন দিতে পারে না!

তবুও দিন কেটে যায়। অফিস থেকে বেরিয়ে সে সোজা আসে নাইট ক্লাসে। সে সব সেরে সে যখন বাড়ি ফেরে তখন ঘড়িতে রাত সাড়ে নটা বেজে গেছে।

বাড়িতে ঢুকতে তার একবার পা কাঁপে। কি আছে তার ভাগ্যে? শর্মিলাকে লাভ? না অপমান?

কিন্তু অপমান করলে সে আজ আর মুখ বুঁজে সহ্য করবে না। সেও বুঝিয়ে দেবে, পুঁজিবাদীদের দিন শেষ হয়ে এসেছে।

নিজের ঘরে গিয়ে সে জামা কাপড় বদলায়।

এমনি সময় দারোয়ান রাম সিং এসে তাকে খবর দেয়—উপারমে বাবু বলাতা হ্যায়।

দুরুদুরু বক্ষে সে ওপরে উঠে যায়। মনকে সে শক্ত করবার চেষ্টা করে এই বলে—অন্যায় দাবি সে করেনি।

শতদলবাবুর ঘরে ঢুকে দেখে ঘরের মধ্যে একটা নীল আলো জ্বলছে। সামনে ব্রাণ্ডি আর সোডার বোতল। চক্ষু তাঁর রক্তবর্ণ। পাশে দুলাল বসে রয়েছে। মুখ তার গম্ভীর। থমথম করছে।

পুলিন ঘরে ঢুকতেই দুলাল চেঁচিয়ে বলে—You rascal! এ চিঠি তোমার লেখা?

পুলিন একটু জোর দিয়েই বলে—হ্যাঁ।

— একটা নায়েবের ছেলের এত স্পর্ধা ! জুতোর তলায় তোমার থাকা উচিত জানো ? তুমি বিয়ে করতে চাও শর্মিলাকে ?

শতদলবাবু বলেন—Don't be excited my boy ! তাতে ফল কখনই ভাল হয় না। যদি তোমার আপত্তি থাকে সেটা তুমি ভদ্র ভাষায় ওকে জানিয়ে দাও।

দুলাল বলে—থামুন বাবা ! আদর দিয়ে দিয়ে শর্মিলার আপনি মাথা খেয়েছেন। আর এই সমস্ত পথের কুকুরগুলোকে ডেকে ঘরে ঢুকিয়ে আপনি এদের মাথায় তুলেছেন। আজ তো এরা কামড়াবেই ! একটা বংশপরিচয়হীন ছেলে, বেশ্যার কোলে যে মানুষ, সে চায় শর্মিলাকে বিয়ে করতে ! Whip করে—

পুলিন এবারে সমস্ত শক্তি একত্রিত করে গর্জে ওঠে—থামুন দুলালদা থামুন ! আপনি যে মেমসাহেবকে বিয়ে করেছেন তিনি কোন lord familyর, না রাজকন্যার মেয়ে ? আর চাবুক চালাতে চান ? মনে রাখবেন চাবুক চালানোর দিন শেষ হয়ে গেছে। এইবার চাবুক চালাবো আমরা, আমাদের রক্তজলকরা পয়সা আপনারা কেড়ে নিয়েছেন বলে। কড়ায় গণ্ডায় তার হিসেব আপনাদের দিতে হবে।

দুলাল চেঁচিয়ে বলে—আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে তুমি আমাকে অপমান কর ? Get out, get out, I say !

—বেরিয়ে যাচ্ছি—পুলিন ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলে। তার জন্যে চেঁচাবার কোন প্রয়োজন নেই। ভদ্র ভাষায় বললেই হতো। তবে যাবার আগে বলে যাচ্ছি—আপনাদের ভদ্র মুখোশটা আজ খসে পড়েছে। সুবিধেমত লোককে একথা জানাতে আমি ভুলবো না। কতখানি গরিবের বন্ধু আপনি তাও বোঝা গেল আজ।

শতদলবাবু চেঁচিয়ে বলেন—আঃ দুলাল ! পুলিন ! শান্ত হও বাবা ! কি করছো তোমরা ছেলেমানুষি !

পুলিনের মাথায় তখন আগুন চেপেছে,—পুলিন বলে—ভদ্রতার মুখোশে আর নিজেকে ঢাকতে পারবেন না শতদলবাবু। আমি চলে যাচ্ছি। এক জামা কাপড়ে আপনার বাড়িতে ঢুকেছিলাম, আজও তাই এক জামা কাপড় পরে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমার বাক্সটা খুলে হাজার দু'-এক টাকা পাবেন। তাইতে আশা করি আপনার ঋণ শোধ হয়ে যাবে। আর আমার বাক্সটা খুললে আপনার মেয়ের লেখা খানকতক চিঠিও পাবেন। ইচ্ছে করলে যা আমি কাজে লাগাতে পারতাম। লাগাবো না কারণ আমার কৃতজ্ঞতাবোধ আছে। আমরা মেহনতী মানুষ—দুঃখকে ভয় করি না। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

কথা শেষ করে হনহন করে পুলিন বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। তারপরে দ্রুত নামতে শুরু করে সিঁড়ি ধরে।

ওপর থেকে শোনা যায় শতদলবাবু তখন ডাকছেন—পুলিন, পুলিন, শুনে যাও আমার কথা।

সেইদিন থেকেই পুলিন রাস্তায় নেমে এসেছে। প্রথমে কয়েক রাত কাটিয়েছিল তার দু'একজন বন্ধুর বাড়ি, পার্টির অফিসে। তারপর বেছে নিয়েছিল এই হোটেলটা। এখান থেকেই সে ঘুরেছে উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ক্যাম্পে। সেখানে সে দেখেছে বাঁচবার জন্য মানুষের কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা। শিয়ালদহের প্ল্যাটফর্মের ওপর গরু ছাগলের মতই মানুষ রাতের পর রাত কাটিয়েছে—পেটে অন্ন নেই, পরনে বস্ত্র নেই। তবু তাদের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা! তাদের মৃতপ্রায় মুখেও সে শুনেছে পাপ পুণ্যের কথা। অসৎ পথ তারা জীবনে নেবে না। সৎপথে তারা গতর খাটিয়ে রোজগার করবে।

আমারও তখন যেন মনে হতো বিধবা হয়ে আমিও যেন বিরাট অন্যায় করে ফেলেছি। ভগবানে মন দেবার চেষ্টা করলাম কিন্তু পাড়ার নেপাল যখন আমাকে দেখে শিস দিত তখন গায়ের মধ্যে সিরসির করতো।

মা বলতো—ও সমস্ত পুরুষের পাল্লায় পড়িসনি। ওরা বদ ছেলে। তোকে ভোগ করে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবে। তার চেয়ে ভগবানে মন দে, অনেক শান্তি পাবি। কিন্তু আশ্চর্য পুলিনবাবু, আমি যখন এই অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি আমার মায়ের তখন ছেলে হচ্ছে। তাহলে বুঝতেই পারছেন বাপ, মা সকলে কতটা আমার দুঃখে দুঃখিত! একবার ভাবলাম ওই নেপালের সঙ্গেই পালিয়ে যাই। কিন্তু তাতে মনে হলো, ওই নেপাল যদি কিছুদিন পরে সত্যিই আমাকে ফেলে দিয়ে যায়? তখন দেহ বিক্রি ছাড়া তো আর আমার অন্য পথ থাকবে না। তাই, জীবনের পথে চলবার জন্যে বাবাকে ধরে বসলাম লেখাপড়া শেখবার জন্যে। লেখাপড়া শিখলামও।

এই লেখাপড়া শেখবার সময় বুঝেছি, সব পুরুষের মনে কি তীব্র ভোগের আকাঙ্ক্ষা।

আমি তখন ক্লাস নাইন কি টেনএ পড়ি। জানি না কেন, অনুরোধ না করা সত্বেও স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার মশাই আমাকে পড়ানোর ভার নিয়েছিলেন। বয়েস তাঁর পঞ্চাশের ওপরে।

দেরিতে লেখাপড়া আরম্ভ করার দরুন একটু বয়সও আমার হয়েছে।

একদিন রাত্রে একটি ইংরেজী কবিতা পড়াতে পড়াতে হঠাৎ দেখি তাঁর চোখের দৃষ্টি বার বার আমার ওপর স্থির হয়ে যাচ্ছে।

বইএর দিকে তিনি দৃষ্টি ফেরাতে পারছেন না। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন।

তখন ছিল গরমকাল। একটা পাতলা জামা পরে ছিলাম। আমার মধ্যে কি নতুনত্ব দেখা দিচ্ছে যার জন্যে তাঁর দৃষ্টি বইতে যাচ্ছে না, সেই কারণটা দেখতে গিয়েই চমকে উঠলাম।

অন্যমনস্কতার দরুন আমার বুকের কাপড়টা সরে গিয়েছিল। তাই ওই বৃদ্ধের দৃষ্টিও আমার প্রতি নিবদ্ধ হয়েছিল।

তাহলে পুলিনবাবু, বলুন তো, সুখ ভোগ কি একা তারাই করবে যাদের ক্ষমতা আছে? আর বিধবা বলে আমাদের কি কোন অধিকার নেই?

কলেজ থেকে বি. এ. পাস করে তাইতো নিয়েছি এই ব্রত। যাদের আছে তাদের কেড়ে নেব। ভোগ আমিও করব। "To each according to her needs."

পুলিনের মনে হয় এর সঙ্গে শর্মিলার তুলনাই হয় না। শর্মিলা ইংরেজী স্কুলে পড়েছে বটে কিন্তু তার ভেতরটা আজও সেই পুরনোপন্থী আছে। নতুনের সন্ধান সে পায়নি। আজও সে গরদ পরে, সকালবেলায় ঠাকুরঘরে যায়। চন্দন ঘষে। বেলপাতায় তা মাখিয়ে শিবঠাকুরের মাথায় চড়ায়। ভাল স্বামী পাবার আশায়।

রেণু বর্তমানের প্রতিচ্ছবি আর শর্মিলা অতীতের প্রেত ছাড়া কিছুই নয়। যদি তার সঙ্গে বিয়ে হতো, তাহলে তার জীবনটাকে সে পঙ্গু করে দিত। নতুন আলোর সন্ধান কোন দিনই সে পেত না। উঃ, কী ভুলই না সে করতে গিয়েছিল! বরাত জোর, রক্ষা পেয়েছে।

রেণু বলে—কী ভাবছেন পুলিনবাবু?

পুলিন বলে—বিশেষ কিছুই নয়। ভাবছি you are a wonder. আমাদের দেশের সব মেয়েই যদি আপনার মত প্রগতিশীল হতো তাহলে দেশের উন্নতি খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যেত।

—এই রাজা উৎখাতের সঙ্গে সাধারণ লোকের সম্বন্ধ ছিল না। তাই এরা ঠিক বুঝতে পারেনি কি হয়ে গেল। এ ছাড়া, সরকার পেনশনের ব্যবস্থা করেছেন এদের জন্যে। রাজকীয় জাঁকজমক আগেকার মতই আছে, কিছু কমেছে। লোকে ভাবলো তাদের রাজত্ব ঠিকই আছে। কিন্তু গোল বেধেছে এইবার। এই জমিদারি উচ্ছেদ নিয়ে। আমাদের তেভাগা আন্দোলন—জমিদার রক্তশোষক—তাদের পৃষ্ঠপোষক ওই সরকার—একথা বলা আর চলবে না। তাছাড়া শ্রমিকদের জন্যও সরকার আলাদা দপ্তর খুলেছেন। তাদের জন্যে নিযুক্ত হয়েছে নতুন মন্ত্রী। নতুন বিচারালয়ও হয়েছে। এখন কোন্ পথে যাব তাই ভাবছি।

রেণু বলে—প্রহ্লাদদা, এর জন্য এত ভাবনার কি আছে? আমাদের দেশ অশিক্ষিতের দেশ। যাত্রাগান থেকে তারা অনেক দার্শনিক তত্ত্ব শেখে। সেটা তাদের জীবনে প্রভাব বিস্তারও করে।

প্রহ্লাদদা বলেন—True!

—আমাদের থেকে একদল ছেলেমেয়ে সংস্কৃতি, কৃষ্টির নামে যদি এই ধরনের একটা যাত্রার দল খোলে এবং গ্রামে গ্রামে গিয়ে তারা বোঝায় তাদের বর্তমান সমস্যার জন্য দায়ী সরকার তাহলে কতক্ষণ সরকারের প্রচারকার্য সফল হবে?

প্রহ্লাদদা বলেন—Very constructive idea. রেণু, তুমি আমাকে একটা সমস্যার হাত থেকে বাঁচালে। এ যদি তুমি করতে পার তাহলে আমাদের দলের জয় অবশ্যম্ভাবী। কিছুতেই আমাদের সঙ্গে সরকার পারবে না। ক্ষমতা আমাদের হাতে আসবেই। Well, তুমি এর ব্যবস্থা কর! আজ বিকেলেই তুমি পার্টির অফিসে এসো। তোমার তেমন বই কিছু ঠিক করা আছে?

সলজ্জভাবে রেণু বললো—একটা বই আমি লিখেছিলাম। দেখুন, আপনার পছন্দ হয় কি না।

হাতব্যাগটা খুলে রেণু তার থেকে এক তাড়া কাগজ এগিয়ে ধরে প্রহ্লাদদার দিকে।

প্রহ্লাদদা তার হাত থেকে সেটা নিয়ে বলেন—ঠিক আছে। ঠিক পাঁচটায় তোমরা এসো পার্টির অফিসে। সেখানে ডাঃ বোস আসবেন, প্রফেসর দত্ত আসবেন। তাঁদের সকলকার সামনে এ প্রস্তাব আমরা অনুমোদন করব।

ওরা নমস্কার করে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

পুলিন বলে—এখন কোথায় যাবেন? সবে তো দুটো। হাতে তো প্রায় তিন ঘণ্টা সময় আছে। আমার হোটেলে ফিরবেন?

রেণু বলে—না না, পুলিনবাবু! ঘরের মধ্যে আর নিজেকে বন্ধ করতে ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে চলুন আমরা গিয়ে বসি ইডেন গার্ডেনে। মাথার ওপরে থাকবে নীল আকাশ, পায়ের তলায় সবুজ মাঠ। সামনে কলনাদিনী গঙ্গা। দেশ-বিদেশ থেকে আসবে কত জাহাজ। নিজেকে হারিয়ে ফেলবার মত এর চেয়ে ভাল জায়গা আছে কি?

পুলিন বলে—কে বলে শিক্ষয়িত্রীর বুকে কবিতা নেই? এই তো বেশ কবিতা বলছেন আপনি!

রেণু একটু হেসে বলে—পুলিনবাবু, শিক্ষকতা করি, সেটা নিছক পেটের জ্বালায়। তাই বলে কি আমার মনের সব রংটুকু নষ্ট হয়ে গেছে। শিক্ষয়িত্রী বলে কি আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা সব জলাঞ্জলি দিয়েছি। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমিও মানুষ। ঘর আমাকে স্থান দিল না বলে পথে নেমেছি। তাই বলে কি ঘর বাঁধবার আকাঙ্ক্ষা ছেড়েছি?

একথার জবাব পুলিন কি দেবে? তাই সে চুপ করেই থাকে।

সামনে একটা হাইকোর্টগামী ট্রাম এসে পড়েছিল। তারা দুজনেই উঠে পড়ে তাতে।

ইডেন গার্ডেনে গিয়ে ওরা বসে একটা বেঞ্চে। কিন্তু রেণুর মুখে কোন কথা নেই। সে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। পুলিন যে আছে তার পাশে সেকথা তার যেন খেয়ালই নেই। শীতকালের বেলা। রোদ্দুরটা বেশ ভালই লাগছিল।

অন্যদিকে একটা গাছের মাথা থেকে একটা পাখি ডেকে উঠলো। ডাক শুনে রেণু বলে—কত দিন, কত দিন ওই ডাক শুনিনি পুলিনবাবু!

পুলিনের মনে হলো—সত্যি তো! কত দিন সে এই ডাক শোনেনি।

গ্রামে থাকতে পাখির ডাক শুনে, লুকিয়ে কতবার গাছে ওঠবার চেষ্টা করতো। একবার একটা পাখিকে ধরেও ছিল। তারপর পিসীমার কাছ থেকে পয়সা আদায় করে খাঁচা কিনেছিল। কিন্তু পাখির ডাকের মধ্যে যে এত মিষ্টতা আছে, সেকথা যেন সে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল।

কলকাতার ইঁট-কাঠের মধ্যে সব গ্রাম্য সৌন্দর্য চাপা পড়ে গিয়েছিল। তার মাথায় কেবল একটা চিন্তা খেলেছিল—তাকে মানুষ হতে হবে।

সে এম. এ. পাস করেছে। কিন্তু তাতে কি হোলো? কলকাতায় তার মত শত শত ছেলেমেয়ে এম. এ. পাস করে বেকার ঘুরে বেড়ায়। কি দাম আছে? এর চেয়ে ছেলেবয়েস থেকে সে যদি ব্যবসায় মন দিত, তাহলে হয়তো টাকাও রোজগার করতে পারতো।

এ সংসারে খাতির তো টাকার! তাইতো সে এই ব্রত নিয়েছে। পুঁজিবাদীদের ধ্বংস করতে হবে। খেটে খেতে হবে। না খাটলে, তার রুটি নেই তার সমাজে। নতুন আদর্শ দেখাতে হবে সমাজকে।

হয়তো তার মত শত শত ছেলেমেয়ের প্রাণ যাবে লক্ষ্যে পৌঁছুতে। তা যাক। একদিন তো দেশের লোকে সুখী হবে। আশীর্বাদ করবে তাকে। হয়তো তার ছবি সেদিন শহিদ বেদীতে উঠবে। আজ যা উঠছে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, দীনেশ গুপ্ত, বিনয় বোসের।

নিজের চিন্তায় সে ডুবে গিয়েছিল। হঠাৎ তার চমক ভাঙলো রেণুর ডাকে।

রেণু বললো—চারটে বেজে গেছে। চলুন এইবার পার্টির অফিসে যাবার জন্যে তৈরী হওয়া যাক। এক কাপ চা খাওয়াতে হবে কিন্তু।

অপ্রতিভ পুলিন বলে—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, সেকথা আর বলতে!

একটা রেস্টুরেন্ট থেকে বিকেলে চা খেয়ে ওরা এলো পার্টির অফিসে। নেতারা সমবেত হয়ে রেণুর পরিকল্পনাকে অনুমোদন করলেন।

প্রহ্লাদদা বললেন—বইটা ভালই। নাটক হলে জমবে ভাল।

এরই মধ্যে তিনি সেটাকে পড়ে ফেলেছেন।

সেই দিনই পার্টির অনেকে নাম লেখালো এই যাত্রায় অংশ গ্রহণ করবে বলে।

পরিচালনার দায়িত্ব নিজে হাতে রেণুই নিল।

হঠাৎ কিন্তু রেণু প্রহ্লাদদাকে লক্ষ্য করেই বললো—আপনারা সবাই আছেন। আমাকে কিন্তু অভিনয় করতে গেলে চাকরি ছাড়তে হবে। দু'দিক তো করা চলবে না। তাছাড়া, গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে। এসব করে স্কুলের চাকরি তো আমি রাখতে পারব না। আপনারা জানেন সংসারের একটা মোটা খরচ আমাকেই দিতে হয়। সেটার জন্যও তো আমার কিছু টাকা চাই। অবশ্য পারলে পার্টির জন্যে আমার অমনি করাই উচিত।

প্রহ্লাদদা বলেন—নিশ্চয়ই, quite true! পার্টির তহবিল থেকে প্রত্যেককেই মাইনে দেওয়া হবে। তবে কি জান, হয়তো তোমাদের যোগ্য টাকাটা আমরা দিতে পারব না। তবুও আমরা কিছু কিছু করে তোমাদের দেবই, যাতে তোমাদের ভালভাবে চলে যায়। What about my boy—পুলিন? তুমি কি করবে?

পুলিন কিছু বলবার আগে রেণু তার হয়ে জবাব দেয়—পুলিনবাবুও থাকবেন। ওঁকে দিয়ে আমি হিরোর পার্ট করাব। তাছাড়া এ ধরনের যাত্রাদলের মধ্যে একটা বিশ্বাসী ম্যানেজারের মত লোক তো থাকা দরকার। আমাদের কাজ তৈরী হয়ে গেলেই উনি চাকরি ছেড়ে দেবেন।

পুলিন বলে—কিন্তু অফিসের দিকের প্রচারের ভার কে নেবে?

প্রহ্লাদদা বলেন—অন্য ব্যবস্থা করব, তাছাড়া টাকার ভাবনা খুব একটা হবে না। খুব শিগগির আমরা অন্য জায়গা থেকে সাহায্য পাব।

উল্লসিত হয়ে রেণু বলে—পাব নাকি? তাহলে খুবই ভাল। তাহলে তো আমরা নির্ভাবনায় কাজে মন দেব। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে বেশ অধিক রাত্রেই তারা বেরিয়ে আসে পার্টির অফিস থেকে।

রেণু বলে—এইবার কিন্তু আমাদের দু'দিকে যেতে হবে। আপনি যাবেন পুবে আমি যাব উত্তরে। কিন্তু যে দিকেই যাই আমাদের লক্ষ্য একই দিকে। তাই নয় পুলিনবাবু?

পুলিন বলে—পৃথিবী যে গোল তা এর থেকেই প্রমাণ হয়। যে মুখেই আপনি চলুন না কেন, বিশিষ্ট এক বিন্দুতে গিয়ে দেখা হবেই।

রেণু বলে—তা বটে। তবে আজকের দিনটার কথা আমি ভুলবো না সহজে। এই জীবনে জন্মাবার পর থেকে অনেকবার সূর্য উঠেছে কিন্তু এমনটি হয়ে কখনও ওঠেনি। সূর্যের আলোতে যেমন জিনিস পরিষ্কার করে দেখা যায় আজ আমিও তেমনি নিজেকে দেখতে পেলাম।

পুলিন বলে—কি করে, কি দেখলেন?

রেণু বলে—নিজেকে চিনলাম।

পুলিন বলে—কি রকম?

রেণু বলে—বুঝলাম আমার ভেতরে যে মানুষটা আছে ঘুমিয়ে পড়লেও সে নারী। সাম্যবাদই করি আর ক্ষমা-ধর্মই গ্রহণ করি, বুকের মানুষটা তাতে জাগে না। সে জাগে তোমার মত পুরুষের স্পর্শে। তাই আমার জীবনের ছেঁড়া পাতাগুলোর মধ্যে রক্তাক্ত অক্ষরে লেখা থাকবে আজকের তারিখটি।

পুলিন আবেগের সঙ্গে রেণুর হাতটা ধরে বলে—কখনও ভুলবে না?

রেণু হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—এক চিন্তায় ডুবে গিয়ে মানুষ দেহকে ভুলতে পারে, কিন্তু তার লক্ষ্যকে ভুলেছে এমন কথা কোথাও শুনেছেন?

পুলিন বলে—আর আমাকে আপনি বলছো কেন? এবারে শেষ করে দাও ওই দূরের পালা।

রেণু বলে—পুলিন, তুমি কি বোকা! শেষ কি আজ করেছি? শেষ করেছি যেদিন প্রথম তোমায় দেখেছি। এখন আমাকে বল, আমাকে তুমি কোন দিন ভুলবে না? তোমার মনের নিভৃত কোণে এতটুকু স্থান দেবে?

পুলিন বলে—স্থান দেব কি রেণু! আজ থেকে তুমি যে সেখানে রানীর আসনে বসেছ!

রেণু বলে—ছিঃ ছিঃ, ও কথা বোলো না! রানীর আসন আমি চাই না। তোমার দাসীর আসনে বসতে পেলেই যথেষ্ট সুখী। পার্টির অফিসে এসেছিলাম নিছক কৌতূহলে। কিন্তু প্রথম দিন থেকে তোমায় দেখে মুগ্ধ হলাম। ঘুরে গেল আমার জীবনের নীতি। তোমাকে পাওয়ার জন্যেই আসতাম পার্টির অফিসে। নয়তো রাজনীতি করার ইচ্ছে আমার কোন দিনই ছিল না। আচ্ছা, অনেক রাত্তির হয়ে গেল, আজ চলি।

পুলিন জিজ্ঞেস করে—কাল আসছো নাকি?

একটা শ্যামবাজারগামী ট্রামে উঠতে উঠতে রেণু বলে—নিশ্চয়ই।

পুলিনও একটা শেয়ালদাগামী ট্রামে উঠে পড়ে।

আজ সতেরো তারিখ। ঘুম ভাঙতেই পুলিনের মনে পড়ে গেল শর্মিলার বিয়ের কথা। কী করবে সে? যাবে? না, উপেক্ষা করবে? কিন্তু না গেলে ওরা ভাববে কিছু দেওয়ার ভয়ে সে যায়নি।

তাছাড়া সে-রাত্রে ওভাবে চলে আসার পর ওদের মনের অবস্থাই বা কেমন হয়েছে একবার খোঁজ করতে পারলেও মন্দ হয় না।

আসবার দিন শর্মিলার সঙ্গে একবার দেখাও হয়নি তার।

শর্মিলা নিশ্চয়ই দুলালের সঙ্গে তার অপমানে খুশী হয়ে উঠেছিল। আনন্দে তার মুখখানা চকচক করে উঠেছিল। পরক্ষণে তার মনে হলো, তা তো নয়। সে তো ন' দশ বছর বয়েস থেকেই তাকে দীর্ঘদিন ধরে ভালবেসেছে। ছেলেবয়েসে দুলাল তাকে কতবার তার সঙ্গে খেলতে বারণ করেছিল। কিন্তু সে তো শোনেনি!

এমন কথাও তার মনে পড়ে, শর্মিলা তাকে একথাও বলেছিল—ছোড়দা আমাকে তোমার সঙ্গে খেলতে বারণ করে। বলে—ও সমস্ত ছোটলোকের সঙ্গে কেন খেলিস খুকু? আমরা হচ্ছি ওদের মনিব। ওদের বাবু। আমরা যদি ওদের সঙ্গে মিশি তাহলে পরে ওরা যে আমাদের মানবে না।

শর্মিলা তার উত্তরে নাকি বলেছিল—বাবু কিসের রে ছোড়দা! ছোটলোক তুই কাকে বলছিস! বাবা বলেন—যারা লেখাপড়া শিখতে পারে না, মুখ্খু, অপরের ক্ষতি করে বেড়ায়, তারাই ছোটলোক। কিন্তু পুলিন তো তেমন নয়।

স্কুলে সে ফার্স্ট হয়। কত ভাল ছেলে সে। আর মুখ্খু তো তুই। তাহলে কে ছোটলোক হলো বল তো?

সুলাল নাকি রাগ করে বলেছিল—তুই আমায় ছোটলোক বললি? দেখ্ কি মজাটাই-না তোকে দেখাই! বাবাকে সব কথা বলে দেব। তারপরে বুঝবি।

এসব কথা পুলিন শর্মিলার মুখ থেকেই শুনেছিল।

হঠাৎ তার মনে হলো শর্মিলা দেখতে রেণুর চেয়ে অনেক সুন্দরী।

বোধ হয় তাকে ভালওবাসে। তার ভালবাসার প্রধান অন্তরায় ওই দুলাল আর সুলাল।

কিন্তু শতদলবাবু? তাঁর ব্যবহারটা তো অন্যরকম। তার মনে আছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে আর দুলাল যখন মোকাবিলা করছিল সে রাত্রে, তখন তিনিই তাদের থামাবার চেষ্টা করেছিলেন। দুলালকে ভদ্র ভাষায় কথা বলতে বলেছিলেন।

তেতাল্লিশের মন্বন্তরে তিনি শত শত লোককে অনাহারের মুখ থেকে বাঁচিয়েছেন। যার ফলে সেখান থেকে আজও দুলাল দু'দুবার বিধানসভায় মনোনীত হয়েছে।

দেখা যাক, তাদের যাত্রাদল খোলা হোক। তাদের গ্রামাঞ্চলে সে প্রচারের কাজে যাবে। তারপর সে নিজে দাঁড়াবে একবার ওই দুলালের বিপক্ষে। তখন ঠিক বোঝা যাবে গ্রামবাসী কাকে চায়।

পুলিন বিছানা ছেড়ে ওঠে। তারপর মুখ হাত ধুয়ে তৈরী হয় অফিসে যাবার জন্যে।

একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে বউবাজারের একটা দোকান থেকে গহনা কিনে নিয়ে সে শতদলবাবুর বাড়ি যাবে। তারপর সেখানে বোঝা যাবে সে ভবিষ্যতে কি কর্মপন্থা অবলম্বন করবে।

সন্ধ্যের সময় সে যখন পৌঁছলো সেখানে তখনও সেখানে নিমন্ত্রিতেরা আসতে শুরু করেনি। বিরাট বাড়ি আলো আর ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ।

গেটের ভেতরে ঢোকবার রাস্তায় ডাইনে আর বামে কর্মচারীদের থাকবার জায়গা। শতদলবাবুর অফিস। তারপরেই শুরু হয়েছে বিরাট উঠোন। সেটা শেষ হয়েছে একেবারে ঠাকুরদালানের সামনে।

ওই ঠাকুরদালানেই 'থ্রোন' সাজিয়ে বর বসবার জায়গা হয়েছে। আর ওই উঠোনটা ঘিরেই জায়গা হয়েছে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের জন্যে।

বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে তার পা একবার কেঁপে উঠলো। এই সেই বাড়ি। যেখানে সে একদিন ঢুকেছিল অনুগৃহীত নায়েবের ছেলে বলে। হঠাৎ তার মনে হলো, তার সে পরিচয় তো মোছবার নয়। সে যাই হোক, আজ লোকে কিন্তু তাকে বলবে সে শতদলবাবুর অনুগ্রহে মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বা সে মুছবে কেমন করে তার জীবন থেকে?

ওই দুলাল, সুলাল যদি তাকে আজ অভ্যর্থনাও জানায়, লোকে বলবে এ হচ্ছে তাদের উদারতা, ভদ্রতা।

নাঃ, এ অসহ্য, সে ফিরেই যাবে। কাজ নেই তার এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে।

তার এই দামী গহনা উপহার দেখেও লোকে বলবে শতদলবাবুই এ সুযোগ করে দিয়েছেন। তার কৃতিত্ব, তার মনুষ্যত্ব কেউ আর স্বীকার করবে না।

রাগ তার আর এই ধরনের পুঁজিবাদীদের ওপর হলো না। হলো সারা দেশটার ওপর। এ দেশটা যেন মরে গেছে। দূর থেকে মৃতদেহটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু যেখানেই হাত দাও দেখবে হিম-শীতল। প্রাণের বুঝি এতটুকু স্পন্দন এর মধ্যে নেই।

—বাবুজী।

পুলিনের চিন্তাজালে ছেদ পড়লো।

দেখে সামনে দাঁড়িয়ে উর্দিপরা দরোয়ান তাকেই লক্ষ্য করে বলছে—।

দরোয়ান বলে—ইধার খাড়া হ্যায় কাহে? আইয়ে ভিতরমে, বড়াবাবু অফিসমেই হ্যায়।

ফেরা আর চলে না। কি ভাগ্য লোকটি নতুন, তাকে চিনতে পারেনি।

তার সঙ্গেই সে এগিয়ে গেল অফিসের দিকটায়।

নাঃ, পরিবর্তন হয়নি বিশেষ কিছুই। সেই একই রকম আছে।

ঘরে ঢুকতেই শতদলবাবু তাকে অভ্যর্থনা করে বললেন—আরে পুলিন যে! এস বাবা এস! আমি জানতাম তুমি আসবে। তা এত দেরি করে আসতে হয়!

তাঁকে অভিবাদন করে পুলিন বসে পড়ে একটা চেয়ারে।

—এ তো তোমাদেরই কাজ। আমি আশা করেছিলাম তুমি সকাল থেকেই এসে এখানে খাটবে। যাক, ভাল আছ?

পুলিনের ভুরু একটু কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। এই বৃদ্ধের পুরানো চাল। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে নিজের কাজ হাঁসিল করবার মতলব। Another way of blood-sucking. দুলালদার ব্যবহার বোঝা যায় কিন্তু এদের ব্যবহার বোঝা যায় না, এদের কূটবুদ্ধি অতি সর্বনাশা—এরা আরও ভয়ানক।

ভদ্রতা বাঁচিয়ে পুলিন বলে—আজ্ঞে ভালই আছি। আপনি?

শতদলবাবু বলেন—ভাল আর কোথায় রইলাম বাবা! তোমার জেঠাইমার রোগটা আজকাল বেশ বেড়েছে। আগে তবু বছরের ভেতর কয়েক মাস ভাল থাকতো, আজকাল একেবারেই ভাল হতে পারে না। সেই একই ভাবে থাকে। শর্মিলাই তো তার সেবাযত্ন করতো। এবার সেও চলে যাচ্ছে। কে তাকে দেখবে? তাছাড়া আমারও তো দিন শেষ হয়ে আসছে। যাক, তোমার কথা বল।

দেশে যাও না শুনলাম। এখানে কি,—

একটু ইতস্ততঃ করে তিনি বলেন—বিয়েথা' করেছ?

পুলিন ঘাড় নেড়ে বলে—না।

শতদলবাবু বলেন—না, পুলিন, এটা তো ঠিক করোনি। তোমাদের আজকালকার ছেলেদের এই বড় রোগ। গ্রামের বাড়িতে তোমরা ফিরতে চাও না। তোমাদের মত শিক্ষিত ছেলেরা যদি সেখানে না যায় তাহলে গ্রামের উন্নতি হবে কি করে? তাছাড়া জানই তো কুসংস্কারই বা দূর হবে কি করে?

দেখ, আগে আমাদের দেশ ছিল ইংরেজদের অধীন। কিন্তু আজকাল দেশ স্বাধীন হয়েছে। সরকারও গ্রামগুলোর উন্নতির

জন্য মন দিয়েছেন। এসময় তোমাদের মত শিক্ষিত ছেলের বড় প্রয়োজন। দেখ, তোমরা যদি তাঁদের সঙ্গে হাত না মেলাও তাহলে বাইরে থেকে তাঁরা গিয়ে কি করে বুঝবেন গ্রামের উন্নতি করতে গেলে কোন্‌টা আগে প্রয়োজন?

পুলিন নীরব। শতদলবাবুর কথা শুনে তার ভুরু আবার কুঁচকে ওঠে।

শতদলবাবুর দৃষ্টিতে কিন্তু তা এড়ায় না। তিনি বললেন—সে কী, বিরক্ত হচ্ছ নাকি? এ ব্যাপারে তোমার মত কি?

পুলিন বলে—দেখুন, তা শুনলে আপনি আঘাত পাবেন।

—আঘাত প্রতিআঘাত আছে বলেই সংসার জীবন্ত। নইলে বোঝা যেত তার শেষ হয়ে গেছে।

দেখ, মানুষ যতক্ষণ কর্মক্ষম থাকে, আঘাতের বিপক্ষে প্রত্যাঘাত করতে পারে, ততক্ষণই তার মধ্যে জীবনের চিহ্ন আছে। যে মুহূর্তে সে সেই কর্মক্ষমতা হারায়, তখনই সে অপরের চোখে মৃত বলে বিবেচিত হয়। কি রকম জান?—

অন্ধকার কাটার সঙ্গে সঙ্গে যে সূর্যালোককে দেখা যায় তাকেই লোকে আহ্বান জানিয়ে প্রণাম জানায়। তাই হলো ঊষা। তখনই জগতে জাগে প্রাণের স্পন্দন। তারপরে ধর দ্বিপ্রহর। পূর্ণমাত্রায় সে আলো দেয়। তখন উত্তাপ সব চেয়ে বেশী হয়।

তারপর আসে অস্তাচলের পালা। ধীরে ধীরে সূর্য ডুবে যায়, লাল হয়ে যায় পশ্চিম আকাশ। কিন্তু তাও থাকে না। অন্ধকার এসে সব আচ্ছন্ন করে। তখন মানুষ প্রতীক্ষা করে আবার নূতন সূর্যের।

ঠিক তেমনি মানুষেরও জীবন। বাল্যকালে শিশু হাসে খেলে। অপরকে আনন্দ দেয়। তারপরেই দেখ নিজের সংস্কার অনুপাতে সে বড় হয়। যৌবনেতেই দেখা যায় তার পূর্ণ বিকাশ। তা ভালও

হতে পারে খারাপও হতে পারে। তারপর দেখ ধীরে ধীরে তার সব কর্মক্ষমতা চলে যায়। একদিন মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করে।

কিছুদিন মানুষ মনে রাখে তাকে। তারপর সে তলিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। আবার নতুন মানুষের আগমন হয়।

ঠিক তেমনি দেখ আমাদের দেশেও আর্য সভ্যতা একদিন এলো। বিপুলাকার ধারণ করলো। ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশে দেশে। তারপর শেষ হয়ে গেল তার দিন। শুরু হলো মুসলমান যুগ। মোগলদের হাতে তার হলো চরম উন্নতি। কিন্তু তা'ও একদিন শেষ হলো।

তারপর এলো ইংরেজ। ইংরেজের দিনও শেষ হয়ে গেল। আবার সূচনা হয়েছে স্বাধীন ভারতের নতুন রাষ্ট্রের। একে তোমরাই তো সাহায্য করবে। এগিয়ে দেবে তার জীবনপথের যাত্রায়।

পুলিন বলে—এ সরকার দিয়ে হবে না। এরা চোর।

শতদলবাবু যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন পুলিনের কথায়। তারপর খানিকক্ষণ থেমে বলেন—দেখ, ভাল মন্দ দুই এর মধ্যে আছে। চোর যে সে-ও তোমার দেশের লোক। আর ভাল যে সে-ও তোমার দেশের লোক। তোমরাই তো সেই খারাপকে উচ্ছেদ করবে। কিন্তু তাই বলে সরকারের সাধু প্রচেষ্টাকে দূরে ঠেলে রাখলে আমাদের উন্নতির পথেই তো বাধা হবে। নন-কোঅপারেশন করলে কোন সরকারই টিকতে পারে না। দেখ, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, সত্তর বছরের ওপরে তাঁর বয়েস। ডাক্তারি করলে তিনি আজও অনেক রোজগার করতে পারেন। কিন্তু দেখ, সব ছেড়ে দিয়ে তিনি কিভাবে দেশের উন্নতির কাজে মন দিয়েছেন।

দুর্গাপুরের মত জায়গার জঙ্গল কেটে তিনি বসাতে চেষ্টা

করছেন নতুন শহর। কলকারখানার সৃষ্টি করে তিনি চেষ্টা করছেন কত বাঙালীর মুখে রুটি তুলে দেবার।

দু'একজন অফিসার অবশ্য ঘুষখোর আছে স্বীকার করি! মুনাফাবাজির মনোবৃত্তি যা গজিয়ে উঠেছিল গত মহাযুদ্ধে, তা এখনও যায়নি মানুষের মন থেকে। তাই বলে, এই প্রচেষ্টাকে তুমি অস্বীকার করতে পার না।

পুলিন বলে—এ "আই ওয়াশ"। দেশে ভাল ভাল রাস্তা তৈরী হচ্ছে বড়লোকদের মোটরগাড়ি করে চলবার সুবিধের জন্যে। বড় বড় কলকারখানা তৈরী হচ্ছে আত্মীয়দের পোষণ করবার জন্যে। গরিবের কি হচ্ছে বলুন? মুখ্যমন্ত্রীই বলুন আর প্রধানমন্ত্রীই বলুন, এঁরা সকলেই বড়লোকের ছেলে। নিজেরা সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনের পথে। তাঁরা গরিবের জন্যে কতখানি চিন্তা করতে পারেন? দেখুন, দাঁতে ব্যথা না হলে, তার যে কি যন্ত্রণা তা তো বোঝা যাবে না!

শতদলবাবু বললেন—দেখ, এটা তোমার গায়ের জোরের কথা। প্রধানমন্ত্রীর কি কোন ত্যাগ নেই তুমি বল?

পুলিন বলে—হ্যাঁ, তাই বলি। যেটুকু তাঁরা করেছেন নাম আর যশের জন্যে, ক্ষমতার জন্যে।

—তার জন্যে তাঁকে কি ছাড়তে হয়েছে তা কি তুমি ভেবেছ? যে লোক বিলেতে শিক্ষা পেয়েছেন, তাঁর পক্ষে উপার্জন করে এদেশে সুখে জীবন কাটান কঠিন হতো না মোটেই। তাছাড়া তাঁর বাবাও প্রচুর রোজগার করে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর একমাত্র ছেলে। কিছু না করেও তাঁর জীবন কাটতো, এবং তা সুখেই, অনেকের চেয়ে ভালভাবে।

কি জান পুলিন? তোমরা দেখনি, আমরা দেখেছি মহাত্মা গান্ধীকে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে, প্যাটেল ভ্রাতৃদ্বয়কে। তাঁরা নমস্য। তাঁদের মত লোক অবশ্য সাধারণের মধ্যে হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমানে

যাঁরা ক্ষমতায় রয়েছেন তাঁরা ওঁদেরই মন্ত্রশিষ্য। এঁরা প্রাণপণে সেই আদর্শকেই বজায় রাখতে চাইছেন। পারছেন না কেবল গুটিকতক স্বার্থলুব্ধ দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারের জন্যে।

এইসব অফিসাররা ইংরেজ আমলেও ছিলেন তাদের পা-চাটা ক্রীতদাস হয়ে। নিজের ভাইকে ধরিয়ে দিয়ে এঁরা চাকরিতে উন্নতি করেছেন। স্বদেশের জন্যে ভাবেননি, ভেবেছেন নিজের জন্যে। আজও ঠিক তাই চলেছে। এঁরা ওপরে loyal, কিন্তু ভেতরে ঘোরতর স্বার্থপর।

তিনি আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে তাঁকে চুপ করতে হলো বাইরে ধুপধাপ শব্দ শুনে।

একটা গোলমাল উত্তেজনা যেন সেখানে ফুটে বেরুচ্ছে। ঠিক এমনি সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো সুলাল।

সে উত্তেজিত হয়েই বললো—সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবা!

শতদলবাবু চমকে উঠে বললেন—কী ব্যাপার, কী হয়েছে?

সুলাল ব্যঙ্গভাবে পুলিনের দিকে চেয়ে বললো—কি হয়েছে ব্যাপারটা বলতে পারেন পুলিনবাবু?

পুলিন বিস্মিত হয়ে গিয়ে জবাব দেয়—আমি কি করে বলবো সুলালবাবু?

—ঠিক বলতে পারবেন। পুলিসের ব্যাটনের সামনে কতক্ষণ কথা চেপে রাখবেন পুলিনবাবু?

শতদলবাবু বলেন—আঃ, সুলাল, কি হচ্ছে! পুলিন আমাদের নিমন্ত্রিত। তাকে অপমান করবার অধিকার তোমার নেই।

সুলাল বলে—ঐরকম আশকারার জন্যেই তো যা ইচ্ছে হয় ও তা করতে সাহস পায়।

শতদলবাবু বললেন—বাজে কথা থাক, কি ঘটেছে তাই বল।

বক্রদৃষ্টিতে পুলিনের দিকে চেয়ে সুলাল বলে—শর্মিলাকে পাওয়া

যাচ্ছে না। তাকে শেষ দেখা গেছে এক ঘন্টা আগে, মায়ের ঘরে। তারপর মুখ ধোবার নাম করে সে বাথরুমে ঢোকে। সেখানে তার সমস্ত গয়না সে খুলে রাখে। তারপর ঝাড়ুদার আসবার দরজাটা দিয়ে সে নেমে যায় খিড়কির বাগানের দিকে।

ওইদিকে আজ লোক ছিল না। সকলেই ব্যস্ত এইদিক নিয়ে। তারপর বাগানের দরজা খুলে—

বৃদ্ধ শতদলবাবু দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন। এতটা শোনার পরই কাঁপতে কাঁপতে তিনি আবার বসে পড়লেন চেয়ারে।

স্থলাল বলে—বাকীটুকু এইবার আপনি বলুন পুলিনবাবু। কোথায় তাকে গায়েব করলেন?

পুলিনের ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে গেল।

সোজা দাঁড়িয়ে উঠে সে বলে—আমার মত নিমন্ত্রিতকে অপমান করা হবে, এ ভাবা আমার আগেই উচিত ছিল। কিন্তু তবুও আমি বোকার মতন আপনাদের সৌজন্যবোধ আর ভদ্রতায় ভুলেছিলাম। আমার শিক্ষাও যথেষ্ট হয়েছে। অপমানও করেছেন গায়ের ঝাল মিটিয়ে। আচ্ছা আমি চলি—

একটা ব্যঙ্গের হাসি মুখে ফুটিয়ে স্থলাল বলে—যাবেন কোথায় পুলিনবাবু! অতটা কাঁচা ছেলে আমাদের ভাববেন না। দাদা খবর পেয়েই পুলিসে ফোন করে দিয়েছে। পুলিস এখন বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। বাড়ির সকলকার স্টেটমেণ্ট এখন নেওয়া হবে। ইন্‌স্‌পেক্‌টারকে আনতে দাদা বাইরে গেছে। সুতরাং সুবোধ বালকের মত যেখানে বসে ছিলেন সেইখানেই থাকুন। নড়াচড়ার চেষ্টা করা বৃথা।

পুলিন অগত্যা আবার নিজের চেয়ারে বসে।

শতদলবাবু এতক্ষণ চোখ বুজেই ছিলেন। কান্নাভাঙা সুরেই তিনি বললেন—যা হবার হয়ে গেছে। ঘরের কেলেঙ্কারি আর

তোমরা বাড়িও না। সাধ্য থাকে বোনকে খুঁজে নিয়ে এসো। না পার, বল, আমি বুড়োবয়সে চেষ্টা করি। বোনকে খোঁজার নামে অতিথি-অভ্যাগতদের অপমান কোরো না। বর আসবার সময় হলো—সেখানে একটা খবর দেবার চেষ্টা কর।

সুলাল ঘর থেকে যেতে যেতে বলে—সাধে বলে বুড়োবয়সে ভীমরতি ধরে! এ সমস্ত লোক কেন যে সংসারে থাকে তা বুঝতে পারি না।

কথাটা বলতে বলতেই সে দ্রুতপদে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

পুলিন চেয়ারে বসে নিজের মনেই গজরাতে থাকে। আর শতদলবাবুর কোন দিকেই তখন দৃষ্টি নেই। চোখ বন্ধ করে তিনি যেন গভীরভাবে কি চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছেন।

* *
*

দিন সাতেক বাদে পুলিন অফিস থেকে একখানা চিঠি পায়। তাতে অভিযোগ করে অফিস জানিয়েছে যে তাদের কোম্পানি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছেন, পুলিন এমন দলের সঙ্গে যুক্ত আছে যারা নাকি কোম্পানির উৎপাদনে সাহায্য না করে বিঘ্নেরই সৃষ্টি করছে।

যদি এ বিষয়ে পুলিনের কিছু বলবার থাকে তাহলে সে কোম্পানিকে লিখে জানাতে পারে। উপযুক্ত কারণ না দেখাতে পারলে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে।

চিঠিখানা পেয়ে পুলিনের মাথায় আবার আগুন জ্বলে উঠলো।

সে গেল ইউনিয়নের কাছে। ইউনিয়নের সেক্রেটারি নতুন বদলি হয়েছে। কিছুদিন আগেও পুলিন ওই পদেই বহাল ছিল।

'হাঙ্গার ব্যাজ' পরে সে মালিকদের ভয় দেখিয়েছিল স্ট্রাইক করবার। সেই থেকেই বোধহয় মালিকরা এই সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

ইউনিয়নের পরিবর্তনের সুযোগ তাঁরা নিলেন। কাজটা অবশ্য আইনের পরামর্শ নিয়ে এমনভাবেই করা হয়েছিল যাতে পুলিনের আর কিছুই করবার ছিল না। তাই চাকরি যাওয়ার এই প্রথম পরাজয় পুলিনকে মানতে হলো। ইউনিয়নকে সে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করেছিল এই বলে যে আজ তার চাকরি যাচ্ছে তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু কাল যখন চাকা ঘুরবে তখন আজকের সেক্রেটারি রাজেন, সোমনাথ কেউই থাকবে না। কিন্তু এই দারুণ অর্থসংকটের দিনে বিপদের ঝুঁকি কাঁধে নিতে কেউ আর এলো না। তারা সকলেই বললো—এ ব্যাপারে তাদের কিছু করবার নেই।

দারুণ আক্রোশে হাত কচলাতে কচলাতে পুলিন বলেছিল—You are all lackeys of the capitalist. তোমরা ধনীদের পা-চাটা কুকুর।

হাসতে হাসতে সোমনাথ জবাব দিয়েছিল—তুমি মিথ্যে রাগ করছো ভায়া, হাত যদি আমাদের খোলা থাকতো, তাহলে আমরা কি কখনও এই মালিকদের ছেড়ে দিতাম! কিন্তু আইনের পথ নেই। আমাদের এখন উপায়? দেখ না মালিকের ছেলে অফিসে আসে সাত দিনে সাতখানা গাড়ি চড়ে। কিন্তু ওই গাড়ির দাম তো আমরাই যুগিয়েছি। সব বুঝি, কিন্তু এখন উপায় কি?

প্রহ্লাদদার কাছেও এ ব্যাপারটা নিয়ে পুলিন গিয়েছিল। প্রহ্লাদদা জবাবে খালি বললেন—ও নিয়ে এখন মাথা ঘামাসনে। সামনে তোর অনেক কাজ। এখন ভাল করে জননাট্য আন্দোলন কর।

পুলিন প্রতিবাদের সুরে বলে—কিন্তু প্রহ্লাদদা, মালিকের এই অন্যায় অত্যাচার আপনি মেনে নিতে বলেন?

প্রহ্লাদদা বলেন—উপায় নেই। শ্রমমন্ত্রী আমাকে সেদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সাবধান করে দিয়ে বলেছেন—আমি যেন এখন ধর্মঘট-আন্দোলনে না যাই। তাতে ফল ভাল হবে না। আমাকে দরকার হলে আইনের ফাঁক পেলে তিনি জেলেও পুরতে পারেন।

এদের সঙ্গে যুদ্ধ আমাদের করতে হবে অত্যন্ত সাবধানে। কারণ ওদের দিকেই এখন আইন। শুধু আইন নয়, রাষ্ট্রশক্তি, পুলিস। ক্ষমতা এখন ওদের হাতে। তাই কি করবি বল্। মেনে আমাদের নিতেই হবে। তার চেয়ে বরং চেষ্টা কর, আগামী নির্বাচনে যাতে আমরা ক্ষমতায় আসতে পারি। তাতে পুলিস ও আইন, দুটোরই সাহায্য আমরা পাব।

পুলিন একটু থেমে বলে—কিন্তু, আমার এখন চলে কি করে?

প্রহ্লাদদা জবাবে বলেন—দরজাটা একটু বন্ধ করে দে, বাইরে কেউ আছে কি না দেখ।

বাইরেটা দেখে এসে পুলিন ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

তবুও নিঃসন্দেহ হবার জন্যে প্রহ্লাদদা জিজ্ঞেস করেন—কেউ নেই তো?

পুলিন বলে—না।

ধীরে প্রহ্লাদদা বলেন—শিগগিরই রাশিয়া থেকে লোক আসছে আমাদের দেশে। তবে এ ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে খুব একটা সাহায্য পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। ওরা যেন কেমন হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে, আমেরিকার অর্থোন্নতি দেখে ওরা যেন নীতি পরিবর্তনের মনোবৃত্তি নিয়েছে। তাছাড়া,—

পুলিন আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে—তাছাড়া আর কি প্রহ্লাদদা?

—স্টালিনের মৃত্যুর পর ওদের সরকারের লোক কেবলই বদলে

যাচ্ছে। সরকারের কড়া দৃষ্টি রয়েছে ওদের দিকে। সুতরাং ওদের কাছ থেকে যে খুব একটা সাহায্য পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। এখন বাকী রইলো চীন।

পুলিন বলে—কিন্তু জাপানের সঙ্গে লড়ে ওরা তো অন্তঃসারশূন্য! মাও-সে-তুং, চৌ-এন-লাই দেশে কম্যুনিজ্‌ম প্রতিষ্ঠা করেছে বটে, কিন্তু চাং-কাই-শেক আজও তো যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেনি। নিজেদের ভেতরই তো মারামারি করছে ওরা।

মুখে হাত দিয়ে চট্ করে শিস দিয়ে প্রহ্লাদদা বলেন—করুক, তাতে আমাদের ক্ষতি নেই। ওরা আমাদের সাহায্য দিতে প্রস্তুত। তাইতে আমরা প্রস্তুত হব। তারপর একদিন আমরা সরকারের গদি উলটে দিয়ে সেখানে গিয়ে বসব।

পুলিন বলে—কিন্তু ওদের দেশেই তো দুর্ভিক্ষ। ওরা টাকা ফেরত চাইবে না?

—এখন ঋণ হিসেবে নেব। পরে টাকাটা ফেরত দিতে কতক্ষণ!

—কিন্তু এত সামান্যতেই কি ওরা মুক্তি দেবে?

প্রহ্লাদদা বলেন—দেখ, পুলিন, লেখাপড়ায় ভাল বলে আমি ভাবতাম তোর বুদ্ধিটাও খোলা, কিন্তু এখন দেখছি,—। ভেবে দেখ সুলতান মামুদের কথা। জয়পালের কথা। দাহির, হেজ্জাজের জয়চাঁদ, পৃথীরাজের কথা, মোহম্মদ ঘোরীর কথা।

প্রথম পানিপথের যুদ্ধের সময় যদি সংগ্রাম সিংহ বাবরের বিপক্ষে লড়তেন, তাহলে কি ভারতের ইতিহাস এমনটি হতো? তারপর ইংরেজদেরও আমাদের ভারতীয়রাই ডেকে এনেছিল। ওদের সাহায্য নিয়েই তারা নিজেদের শক্তিকে বড় করেছিল। তারপর ইংরেজের সময় অত বড় সেপাই-বিদ্রোহটা কিভাবে তারা বন্ধ করলো? সেই কাশ্মীরের গোলাপ সিং-এর সৈন্য দিয়ে তো?

আরে অত বড় যে দিল্লীর কাশ্মীর গেট, তা কি ওরা কোন দিনই ভাঙতে পারতো? যদি না সেদিন চোদ্দজনের মধ্যে আটজন আমাদেরই সৈন্য না থাকতো? সশস্ত্র বিদ্রোহ তো বহুবার হয়েছে। পুলিস, ডিটেকটিভ যারা সেদিনকার বিদ্রোহ দমন করেছে তারাও ছিল আমাদেরই স্বজাতি। কিন্তু এবারে আমরা সে ভুল করবো না। ওদের সাহায্য নেব আমরা ততক্ষণই, যতক্ষণ না আমরা ভারতের ক্ষমতা হাতের মধ্যে নিতে পারি। ক্ষমতা পেলে ওদের তাড়িয়ে দিতে কতক্ষণ! ভাল কথা, অফিসে তুই যা মাইনে পেতিস সেই পুরো টাকাটা তুই এখান থেকেই পাবি। প্রাণপণে চেষ্টা কর যাতে জনমত আমাদের পক্ষে হয়—বিপক্ষে না যায়। বিপক্ষে গেলেই আমাদের পতন। এখন বল, তোর নাট্য আন্দোলনের কি খবর? জোর রিহার্সাল দিচ্ছিস তো? রেণু মেয়েটি সত্যই কাজের। কিন্তু—

—কিন্তু কি প্রহ্লাদদা?

—ও যদি কেবল নাট্য আন্দোলন নিয়েই থাকে, তাহলে তো,—। যাক্, সে পরের কথা। যখন প্রয়োজন দেখা দেবে তখন তার ব্যবস্থা করা যাবে। এখন এই ব্যবস্থাই চলুক।

পার্টির অফিস থেকে হৃষ্টচিত্তেই পুলিন সেদিন ফিরেছিল। ভেবেছিল ভারতবর্ষের বুঝি একটা হিল্লে হয়ে গেল।

নাট্য আন্দোলন বেশ জমে উঠলো। তাদের ডাক দেশের সর্বত্র থেকেই আসতে লাগলো। কাহিনীটাও চমৎকার। রাজা প্রজাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনতে চান না। মদ আর স্ত্রীলোক নিয়েই ভুলে থাকতে চান। দুর্ভিক্ষে পীড়িত হয়ে খিদের জ্বালায় জনগণ সংঘবদ্ধ হয়। তার ওপরে আছে রাজকর্মচারীর অত্যাচার। রাজাকে প্রজারা সংঘবদ্ধ হয়ে জানাতে গেল।

রাজকর্মচারীরা বাধা দিল। রক্তে লাল হয়ে গেল রাজপথ।

প্রজার দাবি—আমরা বিদেশীর হাত থেকে রাজসিংহাসন কেড়ে নিয়ে তোমাকে ওখানে বসিয়েছি। তখন তুমি কেঁদেছ আমাদের দুঃখে, তবে আজ কেন তুমি আমাদের কথা শুনবে না?

রাজকর্মচারীরা উত্তরে বলে—ওরে মূর্খের দল, ত্যাগ করতে শেখ। ত্যাগ করলে দেশ উন্নত হবে। তখন তোরা পেট ভরে খাস।

—কিন্তু খাবার আগে যে আমরা মরে যাব।

গোলমাল গিয়ে পৌঁছুলো রাজার কানে। মদের নেশার ঘোরে তিনি বললেন—ওরা চেঁচাচ্ছে কেন বেখাপ্পা ভাবে?

একজন রাজকর্মচারী বলে—মহারাজ, ওদের পেটে ভাত নেই।

উত্তরে রাজা বলেন—ভাত যদি না পায় তো লুচি খাক, পরোটা খাক।

রাজকর্মচারী আবার বলে—পরনে কাপড় নেই।

রাজা বলেন—কাপড় না থাকলে ওরা আচকান পরুক। আরও দেখতে সুন্দর হবে।

এইখানেই নাটকটা শেষ হয়েছিল প্রথমে।

প্রহ্লাদদা রেণুকে দিয়ে আরও খানিকটা যোগ করেছিলেন তাতে। যোগের মধ্যে ছিল বিদ্রোহিদল অত্যাচারের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে পাশের দ্বীপের রাজাকে খবর পাঠায়। তিনি জনসাধারণের হাতে অস্ত্র তুলে দেন, সৈন্য পাঠান। মুক্তিফৌজের নামে তারা রাহুমুক্ত করে দেশকে।

এটা হলো মোটামুটি কাহিনী।

বিদ্রোহী নেতা কর্ণ সিং-এর চরিত্রে অভিনয় করলো পুলিন আর তার স্ত্রী যমুনা বাঈ-এর ভূমিকায় অভিনয় করলো রেণু।

বেণুকে ওরা অভিনয়ে রানী সহেলী বাঈয়ের ভূমিকায় নামাতে চেয়েছিল। বেণু কিন্তু অভিনয় করতে চাইলো না। সে পরিষ্কার

বললো—এই যদি পার্টির আদর্শ হয়, তাহলে আমি এর মধ্যে আর থাকব না। তার প্রধান কারণ, এতে ভারতীয় নারীর আদর্শ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। আমি যেমন আছি তেমনই থাকব।

রেণু খালি বলেছিল—তুই পুরানোই রয়ে গেলি।

জবাবে বেণু বলেছিল—পুরানোকে ছেড়ে নতুন আদর্শকে গ্রহণ করার মধ্যে তেমন কোন যুক্তি দেখছি না। তাছাড়া পুরানো আদর্শ বাঁচিয়ে দেশের জন্যে যদি কিছু করতে পারি, আমার পক্ষে তা-ই ভাল।

রেণু বলে—তুই যা! কেরানীর স্ত্রী হয়ে বছর বছর ছেলে বিয়ো আর রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেল। আর সংসারের প্রয়োজনে অফ্‌টাইমে চাকরি কর্। তাতে দুজনেই খুশী থাকবি।

বেণু জবাবে বলে—দেখ্, দিদি, দু'শো বছর রাজত্ব করেও ইংরেজ ভারতীয় মেয়েদের ফ্রক পরাতে পারে নি। তুই সেই কাজ হাতে নিতে যাচ্ছিস। দেখিস শেষকালে নীলবর্ণ শৃগাল না হোস!

রেণু বিরক্ত হয়ে গিয়েই বলে—না করবি না করবি, তা বলে অপমান করছিস কেন? আমি যদি নিজের ল্যাজ কেটে আনন্দ পাই, পাব। যারা আমায় দেখে নীল রং করতে চায় তাদের বাধা দেবার অধিকার তোর নেই।

বেণু বলে—সত্যিই নেই দিদি। দেখ্, কতগুলি কাঁচা মাথা চিবিয়ে খেতে পারিস।

বেণু সেই যে চলে গিয়েছিল তারপর আর পার্টির অফিসে ঢোকেনি। তবে এর জন্যে পার্টির অফিসে মেয়েরও অভাব হয়নি। রাজলক্ষ্মী, বিনীতা, সবিতা, কমলা এরা এসেছিল।

এরা যেমনি অভিনয় করতে পারতো তেমনি গানও গাইতে পারতো। চেহারাই বা এদের কত সুন্দর না ছিল!

যাত্রাদলের অনুকরণেই পাখোয়াজ, তবলা, কর্নেট, বেহালা নিয়ে

এদের কনসার্টের দল তৈরী হলো। অভাব কিছুরই হলো না। তফাত হলো কেবল, যারা চিতপুরে যাত্রা করে বেড়ায় তারা বেশির ভাগই হলো অশিক্ষিত, আর এরা বেশির ভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাপ-কাঠিতে শিক্ষিত।

দল তৈরী হয়ে গেলে কাগজে বিজ্ঞাপন পড়লো। কম টাকায় এরা অভিনয় করবে। এদের ডাক আসতে লাগলো সারা দেশ জুড়ে।

পশ্চিম-দিনাজপুর, কুচবিহার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি হয়ে এরা অভিনয় করতে চললো সেই আসাম অবধি।

প্রথম রাত্রে অভিনয় হয়েছিল জলপাইগুড়ির একটা চা-বাগানে। অভিনয় জমলো খুব। রাজলক্ষ্মী, কমলা আর রেণুর অভিনয় দেখলে মনে হয় তারা এ লাইনে নতুন নয়। তাদের অভিনয় দেখে দর্শক কখনও হেসেছে, কখনও কেঁদেছে।

রেণুর তীব্র বক্তৃতা শুনে দর্শকরা উত্তেজিত হলো অত্যাচারী রাজা বিক্রমজিতের বিরুদ্ধে। পুলিন কিন্তু প্রথমে ভয় পেয়েছিল। পা কাঁপছিল। রেণু তাকে ম্যানেজ করে নিয়েছিল।

প্রথম দুটো দৃশ্য হয়ে যাবার পর পুলিনের জড়তা একেবারে কেটে গেল। সেও অভিনয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। কথা ছিল সেখানে এক রাত্রি অভিনয় হবে। তারপর রাত্রি এগারোটার ট্রেনে যাত্রাদল অন্য জায়গায় যাবে।

কিন্তু অভিনয়ের শেষে মালিকপক্ষ ধরে বসলেন অভিনয় তাদের আর এক রাত্তির করতে হবে। বই কোথায়! কিন্তু সেকথা তো বাইরের লোককে বলা চলে না।

এ ব্যাপারে কেবল দেখা গেল রেণু নির্বিকার।

পুলিনের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সে কিন্তু বলে বসলো—হ্যাঁ, নতুন নাটক অভিনয় আমরা কাল করবো। তবে একটা শর্তে

আমাদের কালকের জন্যে কিছু টাকা বেশী দিতে হবে। আর আমাদের যেখানে যাবার কথা ছিল সেখানে গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হবে যে, আপনাদের অভিনয় ভাল লেগেছে বলে আপনারা আমাদের ছাড়লেন না। আজকের রাতের জন্য আমাদের খুব বড় দেখে একটা স্কুলবাড়ি বা ওই জাতীয় কোথাও থাকতে দিতে হবে, সেখানে আপনারা কেউ থাকবেন না।

মালিকপক্ষ তাতেই রাজী। কিন্তু পুলিন বিস্মিত। নতুন বই কোথায়? রিহার্সালই বা দেওয়া হবে কখন?

মালিকপক্ষ চলে যেতেই রেণুকে সে সেকথা বলে।

রেণু হেসে বলে—এত কম বুদ্ধি হলে যাত্রাদলের ম্যানেজারি করা যায় না।

হাসতে হাসতে সে নিজের বাক্স থেকে বার করে একখানা বাঁধানো খাতা। বলে—এমনটি হবে তা আমি জানতাম। তাই আমি তৈরী হয়েই এসেছি। আজ হোল নাইট রিহার্সাল চলবে। প্রয়োজন হলে কাল সকাল দশটা অবধি। তারপরে বিশ্রাম। তারপরে সন্ধে ছটায় সকলে আসরে যাব।

পুলিন তো বিস্মিত। ফাঁকা জায়গায় একটা স্কুলবাড়িতে তাদের আস্তানা পড়লো। খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে নতুন বইএর রিহার্সালে সকলে মেতে গেল। বইটার নাম হলো 'স্বর্ণকীট'। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র গল্পকে অবলম্বন করেই এটা লেখা। তবে দৈত্যরাজকে সেখানে লোহার জালে বদ্ধ রাখা হয়নি। সেখানে করা হয়েছে, প্রকৃতির আলোয় দাঁড়িয়ে সে সোনার খনি থেকে শ্রমিকদের ওপর চাবুক চালিয়ে, সোনা আহরণ করছে এবং জমিয়ে রাখছে। কিন্তু শ্রমিকদের মজুরিটুকুও দিতে সে কার্পণ্য করছে। তার কাছে দয়া নেই, মায়া নেই। সে চায় মানুষের শ্রমে অর্জিত কেবল সোনা।

নন্দিনীকে করা হয়েছে এখানে যুবতী শ্রমিক নেত্রী। তার স্বামী আছে, ছেলে আছে, মেয়ে আছে। মালিকের প্ররোচনায় সে মদ খেতে চায় না। পঙ্গু স্বামী তার। তাকে আর তার ছেলে-মেয়েদের গতর খাটিয়ে সে খাওয়াতে চায়। কোন কুপ্রলোভনেও সে মুগ্ধ হয় না। সে চেয়েছে বাঁচতে সৎভাবে। তার রোজগারে সংসার চলে না। চিকিৎসার অভাবে স্বামী মরে। না খেতে পেয়ে ছেলে মরে। মেয়েও কঙ্কালসার। সেইজন্যে সে নেয় বিদ্রোহের পথ বেছে। শ্রমিকদের খেপিয়ে তোলে মালিকদের বিরুদ্ধে। জয় তাদের হয়।

মালিক তার ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু নন্দিনী আর বেঁচে রইলো না।

রিহার্সাল চললো সারা রাত ধরে। ভোররাত্রে রেণু রিহার্সালে ক্ষান্ত দিল। তখন বই তৈরী হয়ে এসেছে।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় পায়চারি করতে পুলিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। আজকে তার আছে ওই দৈত্যরাজের পার্ট। কিন্তু সে তখন ভাবছিল কি অসামান্য প্রতিভা ওই রেণুর !

কাছেপিঠে কেউই ছিল না। সব লোকই তখন শুয়ে পড়েছিল ওই রিহার্সালের জায়গাতেই।

মেয়েরা চলে গিয়েছিল আর একটা ঘরে। একা পুলিনই কেবল মাঠে পায়চারি করছিল। ঠিক এমনি সময় পেছন থেকে কে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরলো।

মাথায় হাত দিয়ে পুলিন অনুভব করে যে, আগন্তুক নারী, কারণ তার মাথায় খোঁপা। মুখ ফিরিয়ে সে দেখে আগন্তুক আর কেউ নয় —স্বয়ং রেণু।

পুলিন বলে—একি রেণু! তুমি শোও নি ?

রেণু বলে—শোব কি করে ? আমার বুঝি ভয় করে না ?

—ভয় ? পুলিন আরও বিস্মিত হয়ে যায়।

যে সুষ্ঠুভাবে সবল হাতে সমস্ত দলটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার ভয় !

পুলিন বিস্মিত হয়ে গিয়ে বলে—তোমার আবার কিসের ভয় ?

রেণু বলে—ভূতের গো মশাই, ভূতের ।

পুলিন বলে—ভূতের ভয় তোমার ! আর ঘরে যখন আরও অনেকে রয়েছে ?

এইবার রেণু মুখ ভার করে বলে—না, ওদের সঙ্গে আমি শুতে পারব না। তাছাড়া একা শুলে আমার ঘুম আসে না। আর পাশের ঘর থেকে যদি কোন মানুষভূত আসে ? ও বাবারে, সে আমি সহ্য করতে পারব না।

পুলিন বলে—তাহলে তো বড় মুশকিল, এখন উপায় ?

রেণু বলে—উপায় খুব সোজা। তুমি চল আমার ঘরে।

পুলিন স্তব্ধ হয়ে গিয়ে বলে—দলের লোকে বলবে কি !

রেণু বলে—ওঃ ! একটা সিঁদুর আর নোয়ার জন্যে তো ? বেশ কাল থেকে আমি মাথায় সিঁদুর দেব। হাতেও একটা পাঁচ-মণি নোয়া পরব। সকলকে বলব তুমি আমায় বিয়ে করেছ।

পুলিন বলে—আমি ? বিয়ে ? এখন ? কি করে সম্ভব ?

রেণু বলে—কি বোকা তুমি ! পুরুত না ডাকলে বুঝি বিয়ে হয় না ? আসল বিয়ে তো মনের মিল। তা তো আমাদের হয়েই গেছে। তবে বাধাটা কোথায় ?

পুলিন স্তব্ধ হয়ে গিয়ে বলে—এ-ও সম্ভব ?

রেণু যেন এবার রাগ করে। বলে—সংস্কারমুক্ত হও পুলিন, নইলে কোন বড় কাজই হয় না। আর তাছাড়া আমি তোমাকে এখন একা রাখতে পারি না। কাল মেক-আপের পর রাজলক্ষ্মী তোমার দিকে তীব্রভাবে চাইছিল। হয়তো ও ছোঁ মেরে নিয়ে

যাবে তোমাকে। আমি তখন বাধা দিলেও কিছু হবে না। আমি তোমায় চাই। তোমাকে নইলে আমি বাঁচবো না। এটুকু আমায় দয়া কর।

পুলিন বলে—বেশ, সাক্ষী ওই শুকতারা। আজ থেকে তুমি আমার স্ত্রী।

পুলিনের গলা জড়িয়ে ধরে, তার মুখে একটা চুমু খেয়ে রেণু বলে—সাক্ষী ওই শুকতারা, আজ থেকে তুমি আমার স্বামী।

* *
*

সেদিন কিন্তু প্রথমটা প্রথম দিনের মত নাটক জমলো না। প্রথম দৃশ্যেই ছিল পুলিনের পার্ট। দারুণ ভয় তাকে আচ্ছন্ন করেছে। তার ওপর পার্ট মুখস্থ হয়নি মোটেই। একটা অদ্ভুত অনুভূতি।

শ্রমিক কমলা আজ রানী সেজেছিল। তার কেবল নিত্য নতুন গহনার ফর্দ। আশা মেটে না।

পরের দৃশ্যে সময়ের অতিরিক্ত শ্রমিকরা খাটছে। তাদের সঙ্গে আছে নন্দিনী। সে স্বামীর কাছে যাবার জন্য ব্যস্ত। গায়ে জামা নেই, কাঁচুলি পরা। একটা ছেঁড়া কাপড়ে গা ঢাকা। এমন সময় দৈত্যরাজের লোক এসে মিষ্টি কথা বলে তাদের শরবত খেতে দিল।

শরবত খাওয়ার নাম করে তাদের মদ খাইয়ে করলো উত্তেজিত। মাতলামোর দৃশ্যে রেণু এমন সুন্দর অভিনয় করলো যে তাতে দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে গেল। কখনও মদের ঝোঁকে সে নিজের গায়ের কাপড় খুলে ফেলতে চায়, আবার প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করে স্বামী-পুত্রের কথা মনে করতে চায়।

নাটকের গতিও যেন ঘুরে গেল। মালিকপক্ষের যারা নাটক দেখে এতক্ষণ মুখ সিঁটকুচ্ছিল, তারাও নন্দিনীকে দেখে ভুলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত যাত্রার আসরটাকে যেন রেণু একাই টেনে নিয়ে যেতে লাগলো।

নাটক যখন ভাঙলো, সেদিন আর হাততালির শেষ রইলো না। মালিকপক্ষ সেই দিনই তাকে চারখানা মেডেল দিলেন। আর একজন দিলেন কানের দুল।

হাসতে হাসতে আসর থেকে এসে জিনিসগুলো পুলিনকে দিয়ে রেণু প্রণাম করলো। পুলিন বিস্মিত হয়ে গিয়ে বললো—এগুলো ?

রেণু বলে—এগুলো আমি পেয়েছি। তাই তোমাকে দিলাম। তুমিই তো আমার মেডেল। তুমিই তো আমার সব।

সেই রাত্রেই তারা দলবল নিয়ে আবার অন্য জায়গায় চলে যায়।

প্রায় ছ'মাস ঘুরে তারা আবার কলকাতায় ফিরলো।

প্রহ্লাদদা মহা খুশী। তিনি বললেন—আমাদের পার্টির কাজ তোমাদের এই অভিনয়তে অনেক এগিয়ে গেছে। তোমরা যেখানে যেখানে অভিনয় করেছ, প্রায় সব জায়গা থেকেই পার্টির অফিস থেকে আমাকে জানানো হয়েছে তাঁদের কাজ তোমরা দশ বছর এগিয়ে দিয়ে এসেছ। এখন সামনে বর্ষাকাল। তোমরা কলকাতা বা আশেপাশে দু'এক জায়গায় অভিনয় কর। তারপর পুজোর পর থেকেই বেরিয়ে পড় সারা পশ্চিম বাঙলায়। মনে রেখ সামনের ইলেক্‌শনে আমাদের জয়লাভ করতেই হবে।

এবার কলকাতায় ফিরে পুলিন আর একটা জিনিস লক্ষ্য

করলো। অলিতে-গলিতে গজিয়ে উঠেছে চীনা ধোবীখানা। সেখানে যে সমস্ত কাপড় ঝোলে সে মহল্লার লোক তা পরতে পায় না বা পরে না।

এই সমস্ত দোকান চালাচ্ছে একটি কি দুটি তরুণী। এরা এদেশের ভাষা এখনও রপ্ত করতে পারেনি। ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে কোন রকমে কাজ চালায়।

কলকাতার বিখ্যাত রাজপথ চৌরঙ্গী এলাকায়ও গজিয়ে উঠেছে কয়েকটা বিখ্যাত চীনা হোটেল। সেখানে যাতায়াত করে বহু গণ্যমান্য লোক। এরা 'Bar'-এর লাইসেন্সও পেয়েছে।

পুলিন বিস্মিত হয়ে ভাবে—এত চীনা, এরা ছিল কোথায়? কেনই বা হঠাৎ এত ব্যবসা থাকতে ধোবীখানা খুলে বসলো? তার কারণই বা কি?

কথাটা সে একবার প্রহ্লাদদার কাছে তুলেছিল।

জবাবে তিনি বললেন—ওরা এসেছে আমাদেরই সাহায্য করতে। হিমালয়ের ওপারে চীন, এপারে ভারতবর্ষ। আমরা দুই ভাই। ভাই এসেছে ভাই-এর বিপদে সাহায্য করতে, শ্রমিকদের মুক্তি দিতে।

কিন্তু সামনে খাদ্যের দামকে কেন্দ্র করে আমাদের একটা বড় করে মিছিল বার করতে হবে।

তার জন্যে লোক চাই। নয়তো লোকে মনে করবে আমাদের পার্টি কিছুই করে না। একটা মিটিং সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে করতে হবে। তারপর সেখান থেকে একটা বিরাট মিছিল নিয়ে বিধান-বাবুর বাড়ি হয়ে আমরা সোজা যাব অ্যাসেমব্লি হাউসে। সেখান থেকে রাইটার্স বিল্ডিং ঘুরে বউবাজার ধরে আসব সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউতে। সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ হয়ে আমরা সোজা চলে

যাব শ্যামবাজারের মোড়ে। তার জন্যে অন্তত দশ-বারো হাজার লোক চাই। পারবে যোগাড় করতে ?

পুলিন বিস্মিত হয়ে গিয়ে বলে—দশ-বারো হাজার লোক কোথায় পাব ?

—ভেবে দেখ, কোথাও যদি যোগাড় করতে পার।

পুলিন প্রহ্লাদদার কাছ থেকে সেদিন উঠে পড়ে।

রেণুকে ব্যাপারটা কিন্তু জানাতেই এতবড় সমস্যার সে সোজা সমাধান করে দিল।

পুলিন বিস্মিত হয়ে গিয়ে বলে—তুমি বলছ কি রেণু! দশ-বারো হাজার লোক তুমি কোথায় পাবে ?

হাসতে হাসতে রেণু বলে—দশ-বারো হাজার কেন মশাই, প্রয়োজন হলে কুড়ি-পঁচিশ হাজার লোক আনতে পারি। তবে হ্যাঁ, তোমার প্রহ্লাদদা ওদের জন্যে কিছু খরচ করবেন ?

পুলিন বলে—সেকথা তো আমি জিজ্ঞেস করিনি। কারণ ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি। অত লোক আমার সন্ধানেও নেই, আমি যোগাড়ও করতে পারব না। সে কথাটা না হয় তুমিই তাঁকে জিজ্ঞেস কর।

রেণু বলে—বেশ, আমিই জিজ্ঞেস করব। আমিই যদি সব কাজ করি, তাহলে বল তো মশাই তুমি কি করবে ?

পুলিন বলে—তুমি জানই তো, তোমার কাছে আমার বুদ্ধি নগণ্য। ঠিক কথা বলতে গেলে বলতে হয়—I am an idiot in comparison to you.

রেণু হেসে বলে—অতোটা বলো না। একে আমি ছিলুম বিধবা। তার ওপরে হিন্দু নারী। তুমি আমার মাথার মণি। তুমি প্রভু—আমি দাসী।

পুলিন হেসে বলে—এই যত গোলমাল করেছে ধর্ম। বেশ চাল

চেলেছিল। মেয়েগুলোকে একেবারে কথা বলার ক্ষমতা অবধি বন্ধ করে দিয়েছিল। এ করো না, তাই হবে। অমুক করো না, পাপ হবে। ব্যস, হয়ে গেল! আর ছেলেগুলো দেখ, কথায় কথায় ন্যাড়া হয়ে গেরুয়া পরে বেরিয়ে পড়লো—'জয় রাধাকৃষ্ণ'। ভিক্ষের অভাব নেই। খাও দাও, ঘুরে বেড়াও। আবার দেখ, যারা বাড়িঘরদোর ছেড়ে এলো, ভিক্ষে করে তারা কী বড় বড় বাড়ি তুললে! খাবে দাবে ফুর্তি করবে। নাম দিলে 'মঠ'। খাওয়াদাওয়ার নাম হলো 'প্রভুর প্রসাদ'। সন্ধেবেলায় একদল লোক এলো। কেত্তনের নামে খোল পিটে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে হজম করলো। জীবনটা কেটে গেল। ভাবনা কি বল? আজ কিন্তু চাকা ঘুরেছে। বাবাজীদের টনক নড়েছে। আমরা ধর্মটর্ম মানি না!

রেণু হাসতে হাসতে বললো—আমিও মানি না। তাহলে তো উপোসের ঠ্যালায় অন্ধকার দেখতুম। নইলে কি এতদিন টিকতে পারতাম! তোমাকেও পেতাম না। বলুক লোকে আমায় নাস্তিক। কি হবে আমার ধর্ম মেনে?

সন্ধেবেলায় আলোচনাটা ওদের এইভাবেই জমে উঠেছিল। ঠিক সেই সময় ওদের নতুন ফ্ল্যাটের কলিং বেলটা কে যেন টিপে ধরলো।

পুলিন বিরক্ত হয়ে গিয়ে বললো—আঃ, এ সময় আবার কে জ্বালাতন করতে এলো!

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে দরজা খুলে দিলে।

পরমুহূর্তে বিস্মিত হয়ে গিয়ে বলে—জটিদা, তুমি? এস, ভেতরে এস।

জটিদা বলে—চল, যাচ্ছি।

জটি ভেতরে এসে বসে।

পুলিন বলে—তারপর কোথা থেকে আমার ঠিকানা পেলে?

জটি হেসে বলে—আরে, তুই কি বাবা সেই পুলিন আছিস যে তোর ঠিকানা পেতে দেরি হবে? কমরেড প্রহ্লাদদার তুই ডান হাত। তুই—। মানে আমি এসেছিলাম তোর কাছে, আমার একটা উপকার করতে হবে তোকে।

পুলিন বলে—উপকার করব আমি, বল কি।

—প্রহ্লাদবাবুকে ধরে···

পুলিন বলে—বল, কি করতে হবে।

—আমার ভায়ের একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে হবে। উনি যদি—

পুলিন বলে—উনি চাকরির কি ব্যবস্থা করবেন?

—আরে ভায়া, আমি সব খবর রেখেছি। উনি যদি কোন বড় অফিসের ইউনিয়নের সেক্রেটারিকে একখানা চিঠি দেন, কিংবা মুখে অন্তত একবার বলে দেন তাহলে ওনার কথা সকলেই শুনবে। ওঁকে খাতির করে না কে?

একটু ব্যঙ্গের সুরেই পুলিন বলে—আমি তো জানতাম প্রহ্লাদদাকে খাতির করে আমাদের মত গোটাকতক বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ছেলে মেয়ে!

জটি বলে—আরে ভাই, তোদের খাতির করে সমস্ত দেশ। কারণ তোরাই সরকারের দুর্নীতির বিপক্ষে লড়ছিস। আর কেউ তো সাহসই করে না। করবে কি করে বল? ছা-পোষা লোক সব। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। তোদের নীতিকে সমর্থন করতে গেলে যদি চাকরি যায়! চাকরির মায়া বড় মায়া ভাই!

ঠিক এমনি সময় রেণু আগন্তুকের জন্যে চা, জলখাবার এনে দেয়।

বিস্মিত হয়ে গিয়ে জটি বলে—পুলিন, তুই বিয়ে করলি, আমাদের একটা খবর দিলি না? হাজার হোক আমরা তো তোর গ্রামের লোক বটে!

পুলিন একটু বিস্মিত হয়ে গিয়ে বলে—আমি বিয়ে করেছি এ খবর তুমি পেলে কি করে?

—কোন্ খবরটা আর চাপা থাকে বল। আরে, খবর ছোটে হাওয়ার মুখে। তাছাড়া আমাদের বউমা বিদুষী, বি. এ. পাস। নিজে রোজগার করেন।

পুলিন একটু অস্বস্তি বোধ করে। ভাবে, তাহলে এরা অশাস্ত্রীয় বিয়ের কথাও কি জেনেছে?

কিন্তু জটি তখন নিজের মনেই বলে যাচ্ছে—হ্যাঁ, ভাই, একটা খেল দেখালি বটে! গ্রামের মুখ তুই-ই উজ্জ্বল করলি। একদিন ওনাকে নিয়ে চল গ্রামে যাই। শ্বশুরের ভিটেটা একবার ওঁকে দেখিয়ে আনবি চল।

প্রসঙ্গটা ঘোরাবার জন্যেই পুলিন বলে—তোমার মনিবদের খবর কি? জেঠামশাই কেমন আছেন?

জটি বলে—আর বলিসনি, আর বলিসনি। তিতিবিরক্ত হয়ে যাচ্ছি। নেহাত লেখাপড়া শিখিনি—কি করব তাই পড়ে আছি। কর্তা তো সেই মেয়ে যাওয়ার পর থেকে আর কাজকর্ম দেখেন না। নিজের খেয়ালেই থাকেন। আগে মদ খেতেন রাত্তিরে, এখন দিনরাতই মদে ডুবে আছেন। ছেলেদের মুখে তো স্টুপিড আর ইডিয়ট ছাড়া কথা নেই। কাজ ছেড়ে দিতেও পারি না। কিন্তু যা রোজগার করি তাতে চলেও না। প্রতিমাসেই খরচ। তার ওপর সরকার দিলে জমিদারি তুলে। আরে বাবা, তাহলে আমাদের মত নায়েব গোমস্তাদের একটা ব্যবস্থা কর! নয়তো আমরা যাই কোথায়? লেকচার দিয়ে অথচ বলা হচ্ছে যে, দেশের লোকের

ভাল হলো। কি যে ভাল হলো তা ভগবানই জানেন। সেদিন বড়বাবুকে বলতে গেলাম—বাবু, এতে চলছে না, আমাদের মাইনে বাড়ান।

তিনি অমনি সাফ জবাব দিলেন—না চলে, ছেড়ে দিন। আপনার জায়গায় আমরা যথেষ্ট লোক পাব। তাছাড়া কাজ কি বলুন, জমিদারি তো উঠে গেছে।

হিসেব করে তিনি আমায় দেখিয়ে দিলেন আমায় খুব বেশী দেওয়া হচ্ছে।

সে অপমানও সহ্য করে বললাম—বাবু, পাঁচ ছেলের বাপ আমি। তাদের লেখাপড়া আছে। দুটো মেয়ের মধ্যে একটা বিয়ের যুগ্যিও হয়েছে। বিয়ের ব্যবস্থাও কিছু করতে পারছি না। যদি দয়া করে—

অমনি বড়বাবুর মুখে হাসি।

বললেন—দয়া? কে কাকে করে বলুন? আপনি আমায় দয়া করে মাইনেটা নেবেন না সামনের মাস থেকে।

আমি বলি—হুজুর, তাহলে আমার চলবে কি করে?

তিনি বলেন—যেমন করে সব লোকের চলছে।

আমি বলি—হুজুর, এতগুলো ছেলেমেয়ে—

হেসে বলেন—তার জন্যে কি আমাকে দায়ী হতে হবে নাকি? হলোই বা কেন আপনার অতগুলো ছেলেমেয়ে? ছেলেবয়সে নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পারেননি?

শোন কথা! মেরে ফেলবো, ছেলেমেয়েকে? আরে বাবা, ছেলেমেয়ে হওয়া কি আমার হাত? ভগবান দিয়েছেন। আরে আমি তো উপলক্ষ্য মাত্র। আরে পেটে ভাল করে ভাত নেই, তার ওপর চ্যাটাং চ্যাটাং কথারও শেষ নেই। সেদিন, জানলি, ছোটবাবুকে বলতে গেলুম আমার ভাইটা বি. এ. পাস করেছে।

আনন্দের খবর মানুষমাত্রই মানুষকে দেয়। তা আমাকে উত্তরে কি বললে জানিস? আপনার ভাই বি. এ. পাস করেছে, তা আমাকে কি করতে হবে? হাত পা তুলে নাচতে হবে? না, তাকে আমাদের ফার্মে একটা ভাল চাকরি দিতে হবে? তুই দেখে নিস পুলিন, অধর্ম ঢুকেছে ও সংসারে, ও কখনই টিকতে পারে না।

পুলিন বোঝে, জটিদার মত লোক যখন তাদের মনিবের ওপর খেপেছে, তখন নিশ্চয়ই তার কোন স্বার্থে আঘাত পড়েছে। নয়তো এত সহজে চটতো না জটিদার মত শান্ত লোকেরা।

পুলিন বলে—আচ্ছা জটিদা, শর্মিলার কোন খবর পাওয়া গেল?

জটি বলে—না। বিয়ের রাতে সেই যে সে কোথায় পালিয়ে গেল, আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। অনেক চেষ্টা করেছেন বাবু। আর, সেই শোকেই তো মদের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন।

পুলিন এবার প্রশ্ন করে—জেঠাইমা কেমন আছেন?

জটি বলে—একেবারে ঘোরতর উন্মাদ। বোধ হয় কিছু বুঝতেও পারেন না সংসারে কি ঘটছে।

পুলিন বলে—ছেলেরা, বউয়েরা কোন খবর নেয় ওঁদের?

—আরে বড়বউ তো মেমসাহেব! ছোটবউ শিক্ষিতা। তিনি দিনরাত বাপের বাড়ি নিয়ে ব্যস্ত। ব্যারিস্টারের মেয়ে তো! শুনি, ঘুম থেকেই ওঠে তো বেলা নটার সময়। তিন জনে তিন মহলায় থাকেন। কে কার খবর রাখে বল্। আর রাখবার সময়ই বা কোথায়?

পুলিন ভাবে, শর্মিলার কোন খবর পাওয়া যায়নি। সে গেলই বা কোথায়? আজ ওই বিপুল পরিবারটা পড়েছে ভাঙ্গনের মুখে।

জটি হঠাৎ চমকে উঠে বলে—ওরে রাত্তির আটটা বেজে গেল। আমি এখন চলি। কী জানি আবার যদি কোন দরকার হয়—হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে। এর নামই পরের গোলামি।

আর মাইনে বাড়াবার কথা বললে, ন্যায্য অন্যায্য প্রাপ্যের কথা বলে বিভ্রান্ত করবে। ছুটি চাইলে বলবে—দেশে বসে থাকলে তো কুঁড়ে হয়ে যাবে। কিন্তু আমার কথাটা ভুলিসনি ভাই।

জটি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পুলিন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আবার এসে বসে নিজের জায়গায়।

রেণু কাছে এসে প্রশ্ন করে—শর্মিলা কে ?

পুলিনের চিন্তায় ছেদ পড়ে।

পুলিন বলে—যে এসেছিল তারই বাবুর মেয়ে।

—তোমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ?—রেণু প্রশ্ন করে।

পুলিন বলে—না, সম্পর্ক কিছুই নয়। বিয়ের রাত্রে মেয়েটি পালিয়ে গেছে, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম কোন খোঁজ পাওয়া গেল কি না।

রেণু একটু স্থির হয়ে থেকে বলে—মেয়েটি পালিয়ে গিয়েছিল ? কিন্তু কেন ? কারুর সঙ্গে কি তার প্রেম ভালবাসা ছিল নাকি ?

পুলিন মুশকিলে পড়ে। এ প্রশ্নের সে কি জবাব দেবে ? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে তার নিজের মুখেই অপরাধ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু তাতে রেণু যদি কিছু মনে করে ?

বাইরের ব্যবহার দেখলে তাকে অতি আধুনিক ছাড়া কিছু বলা যায় না। কিন্তু তার ভেতরে কি যে আছে তার সন্ধান পুলিন আজও পায়নি। সুতরাং পুলিন বলে—কী করে জানবো বল ? আমার পক্ষে তা কি জানা সম্ভব ?

তাই পুলিন কথা ঘুরিয়ে বলে—যেতে দাও ওসব কথা। ঘোমটা টেনেই লোকে খ্যামটা নাচে। ওরা আমাদের বলে আমরা নাকি সমাজ মানি না, নিজেদের আসক্তিতেই চলি। কিন্তু ওদের

যে কত গলদ তার খবর রাখছে কে? যাক ওসব কথা। তাহলে আমি প্রহ্লাদদাকে বলব, লোক যোগাড় করতে তুমি পারবে?

অন্যমনস্কভাবেই রেণু জবাব দেয়—নিশ্চয়ই।

প্রচুর লোক যোগাড় করলো রেণু। বয়স্ক লোক পিছু এক টাকা, স্ত্রীলোক আর কিশোর পিছু বারো আনা আর আট আনা।

এই হিসেবেই টাকার লোভ দেখিয়ে রেণু বহু লোক জড়ো করলো সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। বক্তৃতা হলো প্রচুর। আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে স্বৈরাচার, মুনাফাবাজি, ইচ্ছে করে গরিবদের কষ্ট দেবার জন্যেই বাঁচবার পক্ষে অ.্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির দাম বাড়ানো, আরও কত কি! গরম গরম বক্তৃতায় লোক উত্তেজিতও হলো। সবার শেষে পতাকা হাতে—"আমাদের দাবি মানতে হবে" ধ্বনি তুলে ওরা চললো বিধানসভার দিকে। রাস্তায় পুলিস গতি রোধ করলো। মিছিলের মুখ ঘুরিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং ঘুরে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ দিয়ে বিভিন্ন ধ্বনি তুলে তারা চলে গেল নিজেদের ডেরায়।

মিছিল পরিচালনা করতে করতে পুলিন দেখলো অফিসফেরত বহু লোক তখন বাড়ি ফিরছিল। তারাও যোগ দিল এই মিছিলে।

গাড়ি, ট্রাম, বাস সব কিছু বন্ধ হলো। স্তব্ধ হয়ে কলকাতার পথচারীরা ভাবলো এতবড় ভুখা মিছিল, এরা এলো কে.. থেকে

পরের দিন খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে প্রথম পাতায় এই সংবাদ ছাপা হলো এই নিয়ে বিধান-সভায়ও প্রহ্লাদদা, ডাঃ বোস সকলে প্রশ্ন তুললেন। দারুণ চেঁচামেচি আর হট্টগোল বেধে গেল সেখানে। অথচ ভুখা মিছিলে যারা যোগ দিল তারা বেশির ভাগই বুঝলো না ব্যাপারটা কি ঘটে গেল।

আবহাওয়া গরম হয়ে উঠতে লাগলো। শেষকালে হরতাল দিবস পালনের জন্য প্রহ্লাদদা আবেদন করলেন। রেণু, কমলা, রাজলক্ষ্মী, বিনীতা—তারা বেরিয়ে গেল কলেজে কলেজে। ছাত্রদের মধ্যে প্রচারপত্র বিলি হলো। তারাও হলো উত্তেজিত। অবশেষে নির্দিষ্ট দিন এলো।

বহুলোক স্বাভাবিক অবস্থাতেই দোকান খুলতে গিয়েছিল। কিন্তু পার্টির জন্যে তরুণের দল উৎসাহিত হয়ে উঠলো। দোকানদারদের ভয় দেখানো হলো, না বন্ধ করলে পুড়িয়ে দেওয়া হবে। দু'একটা দোকান লুটেরও খবর পাওয়া গেল। ভয়ে দোকানদাররা ঝাঁপ বন্ধ করলো।

অফিসযাত্রীর দল অফিসে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতেই পাড়ার ছেলেরা রুখে দাঁড়ালো। যেতে পাবে না, আজ হরতাল। এদের সঙ্গে সকাল থেকেই যোগ দিয়েছিল ওই ছিঁচকে চোরের দল। ভয়ে লোকে হরতাল পালন করলো।

এইভাবেই কেটে গেল আরও তিনটে বছর। এসে পড়লো আবার সাধারণ নির্বাচন। পুলিনের দল আরও তৎপর হলো। নির্বাচনের পর দেখা গেল সরকারের দল যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে, তবে পুলিনের দলও ভাল আসন পেয়েছে এবার বিধানসভায়।

স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীরও আসন কাঁপিয়ে দিয়েছিল পুলিনের দল। মাত্র পাঁচশো ভোটে তিনি জয়যুক্ত হলেন।

প্রহ্লাদদার কাছ থেকে ওরা আশ্বাস পেয়েছিল সামনের বাষট্টি সালের নির্বাচনে তারা রাজনীতির সক্রিয় অনুষ্ঠানে যোগ দেবে। এর জন্যে চাই জনসাধারণের সঙ্গে পরিচয়।

প্রহ্লাদদা নির্দেশ দেন, আমাদের দেশে লোকে এখনও ভোট

দেয় পার্টি দেখে নয়, লোক দেখে। সুতরাং ওপরে পার্টির টিকিট থাকলেও নীচে চাই জনসাধারণের সঙ্গে বন্ধুত্ব। আর সে বন্ধুত্ব এমন হওয়া দরকার যাতে সাধারণ লোকে অকুণ্ঠচিত্তে তাকে বিশ্বাস করতে পারে।

রেণুকে পুলিন জিজ্ঞেস করে—তুমি কোথাও দাঁড়াবে না?

রেণু বলে—না। তুমি যেখান থেকে দাঁড়াবে সেইখানেই আমি কাজ করব। তোমার জয় মানে তো আমারও জয়।

পুলিন মুগ্ধ হয়ে গিয়ে বলে—তা বটে!

পার্টির নির্দেশমতই পুলিনের 'যাত্রা' করা বন্ধ হলো। আর সে জায়গায় নেওয়া হলো নতুন কমরেডকে।

নতুন দল নিয়ে রেণু আবার উৎসাহে মেতে উঠলো। প্রহ্লাদদার নির্দেশ হলো কলকাতার জন্যে চিন্তা কোরো না। এখানকার বহু লোক আমাদের পক্ষে। এখানকার কাজ পার্টির মুখপত্র 'সন্ধি'-ই চালাতে পারবে। তোমরা যাও কলকাতার বাইরে, গ্রামে গ্রামে।

পুলিন নিজের নির্বাচনকেন্দ্র ঠিক করলো তার নিজেরই গ্রাম, যেখানে প্রার্থী হিসেবে থাকতো দুলাল নিজে। ওই দুলালকে তার পরাজিত করতেই হবে। তার এইই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

রেণু যায় তাদের দল নিয়ে দুলালদের গ্রামে যাত্রা করতে। কতদিন পর পুলিন আজ সেখানে এলো।

সেই বারো তেরো বছর বয়সে কিশোর পুলিন জটির সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে গিয়েছিল। এদিকে সে আর আসেনি। আসবার প্রয়োজনও হয়নি। সে ভেবেছিল তার জন্মভূমিকে সে ত্যাগ করে যাবে। কিন্তু আবার সেই জন্মভূমিতেই নিজের স্বার্থে ফিরে আসে। শতদলবাবুর গর্ব তাকে খর্ব করতেই হবে।

কিন্তু গ্রামে পৌঁছে সে চমকে ওঠে। একে আর সেই গ্রাম বলে চেনবার জো নেই। কলকাতা থেকে তৈরী হয়েছে পাকা

পীচের রাস্তা। মাত্র দু'ঘণ্টার প্রয়াসেই সেখানে পৌঁছানো যায়। গ্রামের স্কুলের সঙ্গে তৈরী হয়েছে ছাত্রাবাস। পাঁচ ছ' মাইলের মধ্যে একটা কলেজও তৈরী হয়েছে। পেটজোড়া পিলে নিয়ে যে গ্রামবাসীরা ঘুরে বেড়াতো তাদের মধ্যে অনেকেরই মৃত্যু হয়েছে। যারা বেঁচে আছে তাদের মুখে দেখা দিয়েছে আবার রক্তের চিহ্ন। ম্যালেরিয়া আর নেই দেশে।

গ্রামের কাছেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটা তালা-চাবির কারখানা। সেখানে গ্রামের অধিকাংশ লোকই কাজ করে। চাষের অভাবে তারা আর হাহাকার করে ঘুরে বেড়ায় না। ডি. ভি. সি. থেকে গেছে বিজলীবাতি। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। সে অন্ধকার আর নেই।

পুলিন ভাবে আবার নতুন করে সে গ্রামবাসীর মনে ছাপ দিতে পারবে। কারণ তার অতীত ইতিহাস অনেকেরই জানা নেই।

যাদের জানা ছিল তারা অধিকাংশই মারা গেছে। যারা বেঁচে আছে তারা অধিকাংশই অথর্ব। বেরিয়ে এসে তাকে সনাক্ত করা তাদের পক্ষে সহজ হবে না।

তাই শতদলবাবুর অনুগ্রহের কথা এখানে জানবে না অনেকেই। পুরানো গ্রামবাসী বলে দাবি করলে বিস্মিত হবে না কেউ

যাত্রার আসর পড়লো জোড়া শিবমন্দিরের তলায়। সন্ধের পর যাত্রা শুরু হবার আগে পুলিন আসরে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করলো।

ওই শতদলবাবুদের কাহিনী কেমন করে তারা সরল গ্রামবাসীদের ভুলিয়ে তাদের জমি গ্রাস করে নিজেদের পেট ভরিয়েছে। গ্রামের সুন্দরী মেয়েদের নিরাপত্তা, ইজ্জত কিভাবে বিনষ্ট হয়েছে। মল্লিকরা তেজারতি কারবার করে গ্রামের লোকদের কিভাবে পিষে মেরেছে—সে সমস্ত কাহিনী।

বক্তৃতার শেষে সে বললো যে, তাদের চাপে পড়ে শতদলবাবুরা আজ শোষণনীতি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। মল্লিকরা তেজারতি

কারবার তুলে দিয়ে দরিদ্র গ্রামবাসীর নতুন উপায়ে রক্তশোষণ করার ব্যবস্থা করেছে ওই কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। তারপরে সেই চিরাচরিত কথা। এ ব্যাপার নতুন নয়। যুগে যুগে, দেশে দেশে কীভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ, তার কাহিনী। লোকে মুগ্ধ হলো তার কথা শুনে।

শতদলবাবু এবং মল্লিকদের সম্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী পুলিন সেদিন সভায় বললো, অবশ্য তার অধিকাংশই তার স্বকল্পিত।

মল্লিকদের বিরুদ্ধে এই বিষোদ্গার করবার কারণ পুলিন খবর নিয়ে জেনেছিল, শতদল চৌধুরীর পরিবার আজ ক্ষয়ের মুখে পড়েছে। আর মল্লিকদের পরিবারের সূর্য আবার নতুন করে উদয় হচ্ছে।

মল্লিকদের বাড়ির ছেলে দীপক গত সাধারণ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দুলাল চৌধুরীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছিল। কিন্তু পারেনি। আগামীবারে নির্বাচনে আবার দাঁড়িয়ে সে দুলালকে পরাজিত করবে, একথা সে ঘোষণাও করেছে। সেইজন্য এই বিষোদ্গারের প্রয়োজন হয়েছিল ওদের বিরুদ্ধে।

পুলিন দেখে তার নিজের বাড়ি আজ একটা ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে এইটুকু রক্ষে, মল্লিকরা বা খাজনা অনাদায়ে চৌধুরীরা কেউ তার বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করেনি। ওই ভিটেটুকু দেখিয়ে পুলিন প্রমাণ করে দিল সে এই গ্রামেরই ছেলে। এবং গ্রামবাসীর প্রতি তার আজও দরদ আছে। তাই সে কলকাতার সমস্ত সুখ, বাড়ি-ঘরদোরের সবকিছু নেশা ছেড়ে দিয়ে আজ আবার ফিরে আসতে চায় তার সেই গ্রামে।

তার কাহিনী লোকে বিশ্বাস করলো। প্রথমবারের অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নেই কেটে গেল।

মাইনে হিসেবে যে টাকাটা পুলিন পেয়েছিল তার সব অংশটাই

সে জমিয়েছিল রেণুর নামে ব্যাঙ্কে। রেণুর টাকাও সেই সঙ্গে জমা হয়েছিল।

তার থেকে কিছু টাকা নিয়ে পুলিন বাড়ি সারালো। ইলেকট্রিক নিয়ে আধুনিক হলো। কিন্তু গোল বাধলো দ্বিতীয়বার।

সেদিন রাত্রে যাত্রা ভেঙে যাবার পর পুলিন ফিরে আসছিল তারই বাড়িতে। দলের লোকেরা তারই বাড়িতে থাকে। সেইখান থেকেই তারা আশপাশে গ্রামের মধ্যে তাদের প্রচারকার্য চালায়। ছাত্রদের উত্তেজিত করে। বোঝায় পুরানো সমাজব্যবস্থা ভেঙে ফেলে আবার নতুন করে সমাজ গড়তে।

একরকম পার্টির অফিসেই পুলিনের পিতৃপুরুষের বাড়ি পরিবর্তিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে রেণু একটা বুদ্ধিমতীর কাজ করেছিল। প্রথমটা নিজের থেকে টাকা খরচা করলেও সেখানে পার্টির অফিস প্রতিষ্ঠিত হতেই বাড়ি সারানোর সব খরচই রেণু নিয়েছিল পার্টি থেকে।

দলের দু'একজন কমরেডের সঙ্গে অধিক রাত্রে সেদিন পুলিন ফিরে আসছিল নিজের বাড়িতে। কিন্তু দরজার কাছে এসেই সে চমকে উঠলো।

সাদা কাপড় পরে আদ্দেকের ওপর মুখ ঢেকে একজন স্ত্রীলোক অপেক্ষা করছে।

পুলিন প্রশ্ন করে—কে ?

উত্তর আসে না। ভেসে আসে ফোঁসফোঁস করে একটা কান্নার আওয়াজ।

পুলিনের বুকের ভেতরটা ধক্ করে ওঠে। সে আবার উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করে—কে ওখানে দাঁড়িয়ে ?

কিছুক্ষণ পরে ভাঙা গলায় উত্তর আসে—খোকাবাবু, আমি।

পুলিনকে কে যেন চাবুক মারে !

সে আগন্তুককে চিনতে পারে। আজ ষোল বছর পরে আবার সেই ডাক। কিন্তু পুলিনের চিনতে ভুল হয়নি। কিন্তু ওকে চেনা চলবে না। ওকে চিনতে গেলে বেরিয়ে পড়বে পুলিনের বাপের কলঙ্কময় ইতিহাস। বেরিয়ে পড়বে পুলিনের বাল্যকালের অনেক কথা। কমরেডরাই বা কি ভাববে তাকে! তাছাড়া, হয়তো এই নিয়ে তার বিরুদ্ধপক্ষ কাজে লাগাবে।

তাহলে ও বেঁচে আছে? কেন বাঁচলো? এত লোক তো মরে। ওকে মৃত্যু স্পর্শ করলো না?

পুলিন ক্ষণেকের তরে স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপরে বলে—কে তুমি, কি চাও এখানে?

কথাগুলো একটু রূঢ় স্বরেই পুলিন বলে।

পুতুল তখন কিন্তু আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, নিজের ভাবাবেগেই সে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে পুলিনের দিকে।

নিজের মনেই বলে চলেছে—চিনতে না পারিস বাবা ক্ষতি নেই। এতদিন পরে তুই গাঁয়ে এসেছিস, কত বড় হয়েছিস, আমি তোকে একবার ছুঁয়ে দেখব। চোখদুটোয় ছানি পড়ে গেছে, আর কিছুই দেখতে পাই না রে! তাই এসেছি আমি তোর কাছে। ওরে তুই আমাকে ভুললেও আমি তো তোকে ভুলতে পারি না।

কথা বলতে বলতেই পুতুল এগিয়ে এসেছিল। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল পুলিনকে।

পুলিন বলে—আহা হা, করছ কি, করছ কি।

নিজের আবেগেই তখন পুতুল বলে চলেছে—ক'বার গ্রামে এলি, একবার দেখা অবধি করলি না। ওরে তুই যে আমার হাড়ে মাসে মিশে আছিস। ছেলেবয়সে পাটালিগুড় খেতে ভালবাসতিস। আমি আঁচলে বেঁধে এনেছি। আমার হাত থেকে

নিয়ে তুই একবার খা! কটা দিন আর বাঁচবো! আমার শেষ ইচ্ছাটা তুই রাখ।

পুতুল তাড়াতাড়ি আঁচল থেকে একটা পাটালিগুড় বার করে। তারপর বাঁ হাতে পুলিনকে জড়িয়ে ধরে ডান হাত তার মুখ উদ্দেশ করে নিয়ে যেতে থাকে। তারপর মুখে বলতে থাকে—একবার বউমাকে ডাক—বলতে বলতে পাটালিটা নিয়ে পুলিনের মুখে গুঁজে দিতে গেল।

পুলিন এবার পুতুলকে একটা ধাক্কা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় সেও বোধ হয় তখন নিজেকে ভুলে গিয়েছিল। তাই ধাক্কাটা একটু জোরেই লাগলো পুতুলের গায়ে।

দুর্বল পুতুল সে আঘাত সহ্য করতে পারলো না। ছিটকে পড়ে গেল দরজার ওপরে। দরজার একটা কোণ লেগে তার কপালে অনেকখানি কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো।

পুতুল একটা আর্তনাদ করেই জ্ঞান হারালো।

—কী করলেন কমরেড! বলে পাশের লক্ষ্মীকান্ত ছুটে গেল পুতুলের দিকে।

যাত্রা ভাঙার পর বহুলোক তখন গল্পগুজব করতে করতে সেই পথেই ফিরে যাচ্ছিল নিজেদের ডেরায়। হঠাৎ গোলমাল দেখে, কী হোল, কী হোল, বলে তারাও ছুটে এলো।

লক্ষ্মীকান্ত তখন বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে জল এনেছে। পুতুলের ক্ষতের রক্ত ধুইয়ে দিয়ে সে আইডিন ও তুলো দিয়ে চেপে ধরেছে।

ঠিক এমনি সময় ওই দলের মধ্যে থেকেই একজন ছুটে এসে পুতুলকে জিজ্ঞাসা করে—তোর কি হয়েছে রে মা? কে তোকে এমন করে মারলো?

পুতুলের জ্ঞান এসেছিল। সে ক্ষীণ স্বরে বললো—কেউ মারেনি। আমি নিজে পড়ে গেছি।

লোকটি বলে—তুই বল্ মা, আমি তাকে একবার দেখব। তোর ভোম্বল মাতাল হতে পারে, গুণ্ডা হতে পারে কিন্তু মায়ের অপমান সহ্য করবে না।

পুতুল যেন একটু বিব্রত হয়ে গিয়েই বলে—তোকে বলছি না ভোম্বল, কেউ মারেনি!

—তবে, তুই আঁধারে ঘর ছেড়ে কেন এলি? তোকে তো পাঁচশোবার আসতে বারণ করেছিলাম। তোর মুখে সেই এক কথা, খোকা এসেছে তাকে একবার দেখতে যাব না!

কে তোর খোকা? সে তোকে চিনতে পারলো? ওরে মা, বড়মানুষে যখন দয়া দেখায় তখন তাকে বুঝতে পারি। কিন্তু সে যখন গরিবের বন্ধু সাজে, আমাদের দুঃখে কাঁদে তখন বুঝি আমাদের গলায় ছুরি দিতে সে এসেছে। কেন তুই এলি এখানে? চোখে দেখতে পাস না, তার ওপর ওই পুলিনবাবুর নাম শুনে বলছিস, ওই তোর খোকা! আরে ও যে কলকাতার বাবু! গ্রামের মা-কে ও কি চিনতে পারে?

পুতুল বলে—ভোম্বল চুপ কর্!

ভোম্বল বলে—ভোম্বল কারুর খায়ও না পরেও না। চুপ সে কেন করবে রে? চল্, আর এখানে থাকতে হবে না। এখন বাড়ি চল্। চিনে রাখ এই লোকগুলোকে।

অবলীলাক্রমে সে দুর্বল পুতুলের দেহটা পাঁজাকোলা করে তুলে নেয়। তারপর সেখান থেকে দ্রুতপদে সে চলে যায়।

জনতার মুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে, পুলিন বাক্‌শূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

*

কারুর মুখই চাপা দেওয়া গেল না। ঘটনাটা মুখে মুখে আবার নতুন করে রটতে আরম্ভ করলো।

পুতুলের সঙ্গে পরেশের সম্পর্ক, পুলিনকে মানুষ করবার জন্যে পুতুলের আপ্রাণ চেষ্টা, পুলিনের নৃশংস ব্যবহার বেশ খানিকটা রং নিয়েই ফিরতে লাগলো লোকের মুখে মুখে।

পুতুল অবশ্য লোককে বলেছিল সে পড়ে গিয়েছিল অন্ধকারে ঠাওর না করতে পেরে। অবশ্য এ কাহিনী কেউই বিশ্বাস করেনি। ভোম্বল পুলিসকে খবর দিতে চেয়েছিল, পুতুল তাকে যেতে দেয়নি।

পুলিন এইরকমই একটা আশঙ্কা করে সেই দিনই সকালবেলায় প্রথম ট্রেনেই ফিরে এসেছিল কলকাতায়। রেণু অবশ্য ফিরেছিল আরও দু'দিন পরে। লজ্জায় পুলিন প্রহ্লাদদার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। তার তখন কেবলই মনে হচ্ছে প্রহ্লাদদা শুনলে কি ভাববেন। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে ও অঞ্চলে পার্টির যে কাজকর্ম হলো, তার সবই নষ্ট হয়ে গেল। এখন তাদের দলকে আর কেউ বিশ্বাস করবে না।

দু'দিন ধরে পুলিন কেবলই ভেবেছে এ সমাজে থেকে কিছুতেই উন্নতি করা যাবে না। নিজেদের ভালমন্দ এরা কিছুই বুঝতে চাইবে না। প্রত্যেক মানুষের এরা খুঁত ধরে বেড়াবে। ভেড়ার মত গতানুগতিকভাবেই এরা চলতে জানে। তার বেশী এদের দ্বারা কিছুই হবে না। কিন্তু দেশে সে বিপ্লব আনা তার পক্ষে তো সম্ভব নয়! কীভাবে তা করা সম্ভব? এর জন্যে চাই বাইরের শক্তি

যা আনবে রাষ্ট্রবিপ্লব। কিন্তু তাই বা কি করে হবে? অথচ তা না করতে পারলে ওই দুলালদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।

পুলিন চায় সর্বস্ব যায় যাক দুলালরা ধ্বংস হোক। ওই ওদেরই জন্যে ও হারিয়েছে শর্মিলাকে। শর্মিলার জন্যে আজও তার মন কেমন করে। রেণুকে সে পেয়েছে বটে, কিন্তু ওর প্রাণের স্পন্দন যেন বড় বেশী যার সঙ্গে ও ছুটতেও পারে না। সব সময় ও যেন কি হিসেব করে। পুলিন ভাবে অক্টোপাসের মতনই যেন রেণু তাকে ক্রমশঃ জড়িয়ে ধরছে। কোন ব্যাপারেই যেন তার স্বাধীনতা নেই। পার্টির লোকেও জানে সে রেণুর হাতের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়।

সকলকারই যদি সমান স্বাধীনতা থাকে তবে রেণুর স্বাধীনতা নিয়েই বা তারা কথা বলতে আসে কেন? তাদের তো বলবার অধিকার নেই।

পুলিন বোঝে ঈর্ষায় অন্ধ হলেও এরা মনে মনে সেই সনাতনপন্থী আছে। তাছাড়া সে যে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে গেল তার প্রথম সোপানেই পেল দারুণ আঘাত। তার চেয়ে বাইরের কোন শক্তি এসে যদি তাদের গদিতে বসিয়ে দিত, তাহলে,—

ভাবনায় ছেদ পড়ে। তার ফ্ল্যাটের দরজায় কে বার বার ঘা দিয়ে চলেছে।

দরজা খুলতেই সে চিনতে পারে দেবেনকে। এই দেবেন লক্ষ্মীকান্তর সঙ্গে সেদিন রাতে ছিল। ঘটনার সে প্রত্যক্ষদর্শী।

তাকে দেখেই তার মনের ভাব আবার বিরক্তিতে ভরে যায়। ভুরু কুঁচকে সে প্রশ্ন করে—কি খবর কমরেড দেবেন?

দেবেন বলে—আপনাকে কমরেড প্রহ্লাদদা ডাকছেন। আজকে এখুনি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন।

পুলিন দেবেনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। প্রহ্লাদদার বাড়ি পৌঁছুতেই প্রহ্লাদদা তাকে ডেকে বসান। বলেন—এতদিন আসিসনি কেন ?

পুলিন বলে—আজ্ঞে, মনটা তত ভাল ছিল না।

প্রহ্লাদদা দেবেনকে বলেন—তুমি ঘরের বাইরে যাও।

তারপরে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিতে বলেন পুলিনকে। প্রশ্ন করেন—রেণু ফিরেছে ?

পুলিন বলে—না।

প্রহ্লাদদা বলেন—রেণু ফিরলে তাকে আর খুব বিশ্বাস করবি না। পার্টির কোন কথাও তাকে বলবার দরকার নেই।

পুলিন বলে—তার মানে ?

প্রহ্লাদদা বলেন—তার মানে খুব সোজা। তাকে আর বিশ্বাস করা চলছে না। যার কারণ সে এক বড়লোকের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। কি ব্যাপার জানিস ? একধরনের লোক আছে যারা আদর্শ বোঝে না। তাদের লক্ষ্য হলো কি করে টাকা আর প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। ও হলো সেই ধরনের। যাক, সময় হলেই সব কথা জানতে পারবি। এখন শোন্, যে অবস্থা তোদের গ্রামে হয়েছে তাতে বর্তমানে পার্টির কাজ ওখানে চলা বড় শক্ত। তাই আমি ভাবছি ওখানে নতুন আর কোন্ উপায়ে কাজ শুরু করা যায়।

পুলিন বলে—দেখুন, প্রহ্লাদদা, এ ব্যাপারটা আমি আজ কদিন ধরেই ভাবছি। কিন্তু বলে বুঝিয়ে কিছু করা ভারী শক্ত।

প্রহ্লাদদা বলেন—আমিও যা খবর পাচ্ছি তাতে তা-ই মনে হয়।

পুলিন বলে—যদি কোন বিদেশী রাষ্ট্র আমাদের সাহায্য করে এ ব্যাপারে ?

প্রহ্লাদদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলেন—চুপ !

পুলিন চমকে উঠে একটু আস্তে প্রশ্ন করে—তেমন কোন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কি ?

প্রহ্লাদদা বলেন—নিশ্চয়ই ! চৌ-এন-লাই আসছেন ভারতে। একবার দিল্লীতে যে কোন উপায়ে হোক তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হবে। আমি যতদূর খবর পেয়েছি তাতে জানি, চীন তিব্বত নেবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। তারপর,—

পুলিনের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় এই সব চীনা ধোবীখানার অর্থ।

পুলিন বলে—তাহলে ওরা কাজ শুরু করে দিয়েছে ?

প্রহ্লাদদা বলেন—নিশ্চয়ই ! চৌ-এন-লাই আসছেন তাই দেখতে। সামনের নির্বাচনটায় কিন্তু আমাদের জয়যুক্ত হতেই হবে।

পুলিনের দুঃখ হলো তার নিজের হঠকারিতার জন্যে। তাকে মানুষ করেছে এমন ঝিয়ের কথা বললেই হতো।

তাই সে বলে—আমার গ্রামের ওই সীটটা আমরা বোধহয় হারালাম।

প্রহ্লাদদা হেসে জবাব দেন—অত সহজে আমি আশা ছাড়ি না রে। মল্লিকদের ওই তালার কারখানার দু'একজন শ্রমিক ইতিমধ্যেই দেখা করেছে। ওদের ওখানে আমি একটা ইউনিয়নের ব্যবস্থা করছি। সেখানে শুরু হবে স্ট্রাইক। মালিক-পক্ষকে নামতে হবে আমাদের দিকে। নইলে কারখানা বন্ধ করতে হবে। দেবেনকে আমি পাঠাব ওই কারণে। সে এখন থেকে ওইখানেই কাজ করবে। তারপর প্রয়োজন হলে তাকেও দাঁড় করাতে পারি। কিংবা ওখানের কোন লোককে নমিনেশন দিয়ে দাঁড় করাব।

সেটা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব। তুই এখন আয়, চিন্তা করিস নি। বরঞ্চ আমাদের দৈনিক পত্রিকা 'সন্ধি'র ভার নে।

পুলিন বলে—আমার তো জার্নালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান নেই প্রহ্লাদদা।

জবাবে তিনি বলেন—ছাখ, জ্ঞানের কোন দরকার নেই। খালি খবরগুলোকে আমাদের নীতিতে ফেলে দ্ব্যর্থমূলক ভাষায় ছাড়বি। আর গোপন খবরের জন্যও অভাব হবে না। সরকারের বহু কর্মচারী গোপনে আমাদের পক্ষে। দেখ, আমার খুব বিশ্বাস মনে মনে সকলেই এরা পরিবর্তন চায়। কিন্তু কোন্ উপায়ে এই পরিবর্তন সম্ভব তা হয়তো কেউই বুঝতে পারছে না। আর সরকার এখন অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত। এদিকে মন দেওয়া হয়তো তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই আমাদের কাজেরও বিশেষ অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না।

পুলিন বলে—কিন্তু ওরা যদি আমাদের ঘাড়ে চেপে বসতে চায়? ভারতকে যদি আবার পরাধীনতা—

প্রহ্লাদদা হাত চাপড়িয়ে বলেন—Wait, my boy, wait. ওদের আছে অন্নসমস্যা। ওদের নিজেদের ঘর নিয়েই ওরা ব্যস্ত। আমাদের জন্যে যে টাকা ওরা খরচা করছে বা করবে, সুদসুদ্ধ তা ফেরত পেয়ে গেলেই ওদের আপত্তির কিছু থাকবে না। তারপর গোটা দেশটাকে শাসন করব আমরা। আমরাই ক্ষমতার রজ্জু ধরে থাকব। তারপর—

পুলিনের চোখ আনন্দে জ্বলে ওঠে।

—কবে প্রহ্লাদদা এমনটি হবে?

প্রহ্লাদদা বলেন—কমরেড প্রহ্লাদদা কখনও মিথ্যা কথা বলে নি পুলিন। তবে তোদের সাহায্য চাই। খবরটা গোপনীয় মনে রাখিস।

হৃষ্টচিত্তেই পুলিন সেদিন প্রহ্লাদদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিল। রাস্তায় এসে হঠাৎ তার মনটা আবার ভারাক্রান্ত হলো। সে ভাবতে লাগলো প্রহ্লাদদা ওকথা বললো কেন? "রেণুর থেকে সাবধান! রেণুকে এখন আর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।" রেণু কি তলে তলে কারুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে? কিন্তু সে-কথা সে তো একবারও জানায় নি। কার সঙ্গে বা সে মিশলো? খবর নিতে হয়। এখন কোথায় আছে? কে জানে!

বাড়ি ফিরে সে বিস্মিত হয়েই দেখে রেণু ফিরে এসেছে।

একটু ভারাক্রান্ত হয়েই সে রেণুকে কি বলতে যাচ্ছিল। মুখে হাত দিয়ে রেণু তাকে কথা বলতে বারণ করে।

রেণুর দৃষ্টি অনুসরণ করে পুলিন চেয়ে দেখে ঘরে বসে আছেন ভারতবর্ষের বিখ্যাত ধনী শেঠ লছমীপ্রসাদ।

শেঠজী দু'তিনবার ব্যবসার খাতিরে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। বয়েস বেশী নয়। হাবভাব, চালচলনে একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব। গত বছর একটা স্ট্রাইকের ব্যাপারে রেণু আর পুলিনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। পুলিন জানে শেঠজী টাকা ছাড়া কিছুই চান না।

মোচড় মেরে কি করে টাকা কোথা থেকে আদায় করতে হয় সে বিদ্যেটা এঁর খুব ভাল জানা আছে। আর একটু কথা পুলিনের মনে। শেঠজীর দৃষ্টি পড়েছে এবার রেণুর ওপর। কতদিন ওদের ওই গোপন প্রণয় চলছে?

পুলিনের ভুরু তাঁকে দেখে কুঁচকে উঠলো। কিন্তু সে সংযত হলো, ভদ্রতার কথা স্মরণ করে।

শেঠজী তখন নিজের মনেই ইংরেজীতে বলে চলেছেন —ভারতবর্ষের ডেলিগেট হয়ে যাবেন মিসেস—

রেণু বলে—মিসেস বোস।

—যাবেন মিসেস বোস?

রেণু হেসে বলে—আপনি যদি অনুগ্রহ করেন। কিন্তু সরকার কি আমায় নেবেন?

শেঠজী বলেন—কেন নেবেন না? কলকাঠি তো আমাদের হাতে। সে একটা ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। আপনি বসুন মিঃ বোস! তবে একটা কথা। আপনারা আমার কোন ফ্যাকটরিতে শিগগির কোন স্ট্রাইকের ব্যবস্থা করবেন না।

রেণু বলে—সে কথা আর বলতে। আপনাকে তো সে কথা আমি দিয়েছি। আমায় কিন্তু বিদেশ যাবার ব্যবস্থা করে দিতেই হবে আপনাকে। নইলে কিন্তু আপনাকে আমি ছাড়ব না।

শেঠজীর মুখের কড়া চুরুটের গন্ধ ছাপিয়ে পুলিনের নাকে আর একটা গন্ধ এলো। সে বোঝে এ গন্ধটা বিজাতীয় পানীয়ের।

শেঠজী তখন নিজের মনে বলে চলেছেন—সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনার মত মেয়ে ইণ্ডিয়ার অ্যাসেট। আপনি ঘাবড়াবেন না। আপনাকে আমি মিনিস্টার অবধি করে দেব।

আরও আধ ঘণ্টা পর শেঠজী গেলেন। পুলিন প্রথমে সেখানে খানিকটা বসে ছিল। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে ওদের কথাবার্তার দিকে লক্ষ্য করছিল।

বুকের মধ্যে কেমন একটা বিজাতীয় জ্বালা অনুভব করতে লাগলো যার সূত্রপাত হয়েছিল প্রহ্লাদদার কথা থেকে। তার মনে হলো, সমস্ত জগৎ সংসার তাকে ডেকে বলছে—রেণু বিশ্বাসঘাতিনী।

এই জন্যেই বোধ হয় তখন প্রহ্লাদদা তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু কি বোকা সে! সে এটুকু বোঝেনি! রেণু কোথায় আছে সে খবর নেওয়াটুকুও প্রয়োজন বোধ করে নি। হায় রে মানুষের মন!

কিছুক্ষণ আগে অবধি যে নারীর সঙ্গ তার কাছে পরম আনন্দের বস্তু ছিল তা আধ ঘণ্টা পরে হয়ে উঠেছে গোখরো সাপের চেয়েও ভয়ংকর। তার ছায়াতে পুলিনের অন্তরে কেমন একটা জ্বালার সৃষ্টি হচ্ছে।

এই জন্যেই বোধ হয় মানুষের মনকে কাচের বাসনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা ভাঙলে আর জোড়া লাগানো যায় না।

কিন্তু সে এখন করবেটা কি? এখান থেকে সে চলে যাবে? কোথায় যাবে?

পরমুহূর্তে মনে হলো শর্মিলা তো সর্বস্ব ছেড়ে চলে যেতে পেরেছিল। কিন্তু কেন গেল, কোথায় গেল? রেণুই বা এমনটি করলো কেন তার সঙ্গে? তার এরকম করার অর্থ কি?

ঠিক এমনি সময় তার চিন্তায় ছেদ পড়লো। ও ঘরে শেঠজীকে বিদায় দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে রেণু স্খলিতপদে এসে ঢুকলো তার ঘরে।

তারপরে তার দিকে এগিয়ে এসে বলে—বলি, কেমন আছ? কদিন কি ভাল করে খাও নি? একটু রোগা লাগছে যে? আমার ভাবনা ভেবে ভেবে রোগা হয়ে গেলে বুঝি?

রেণুর এ কথা শুনে পুলিনের আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে। ঘৃণায় সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবু রেণু ছাড়ে না। চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে তার কাছে বসে তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে যায়। ঠেলে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে পুলিন বলে—আঃ, ছুঁয়ো না!

—ছোঁব না?

অদ্ভুতভাবে রেণু যেন হেসে ওঠে।

—কেন কমরেড? রাগ হয়েছে? কিন্তু রাগের কারণ? কখনও তো তুমি আমার ওপর রাগ করো নি। তবে আজ কেন করছো মাইরি?

ঘৃণায় পুলিন উঠে দাঁড়ায়। তারপরে বলে—রেণু, তুমি যে এইরকম তা আমি আগে জানতাম না। তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছি। বিনিময়ে তুমি—

রেণু আবার হেসে ওঠে। বলে—বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছি? অবিশ্বাসিনী? কিন্তু কমরেড ও কথাগুলো তো আমাদের জন্যে নয়। আমরা মুখে বলি ভগবান মানি না, তবুও স্ত্রীর কাছে বিয়ে-করা বউয়ের ব্যবহার আশা করি। তোমার মধ্যে যদি দুর্বলতা না থাকতো তাহলে শুকতারাকে সাক্ষী রেখে আমাদের বিয়ে হলো কি করে? শুকতারা নিশ্চয়ই কোর্টে সাক্ষী দিতে আসবে না আমাদের বিয়ের!

পুলিন স্তব্ধ। কোর্টে সাক্ষী দিতে আসবে না? এ বলে কি? তার চোখ ছলছল করে ওঠে।

রেণুর হাত ধরে সে বলে—কেন, কেন তুমি এ কাজ করলে? বল রেণু। আমি তো কোনদিন তোমায় ঠকাই নি!

রেণুর নেশা বোধ হয় অনেকখানি ঘাত-প্রতিঘাতে কমে গিয়েছিল। তাই সে বলে—দেখ, এ প্রশ্নের জবাব তোমাকে এক কথায় দেওয়া যাবে না। তবে তোমাকে আমি বলছি, তুমি মনে রেখ সেই কথা—To each according to her needs. সে রাত্রে তোমারও প্রয়োজন ছিল আমাকে। আমারও প্রয়োজন ছিল তোমাকে। তাই দুজনকার মিলনের পথ অত সোজা হয়েছিল। কিন্তু আজ আমার জীবন থেকে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। হয়তো তোমারও জীবনে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে—তাই এ নাটকের যবনিকা পড়া দরকার হয়েছে। হ্যাঁ,

ইচ্ছে করলে ব্যাপারটা আমি অবশ্য আরও কিছুদিন গোপন রাখতে পারতাম, কিন্তু গোপন কিছুই থাকবে না। একদিন তা খসে পড়বেই। তাই আমি মিথ্যের আশ্রয় তোমার সঙ্গে নিই নি। সোজা শেঠজীকে নিয়েই তোমার কাছে এসেছি। কারণ আমি চাই জীবনের উন্নতি। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা মানে মৃত্যু, সে মৃত্যু আমি চাই না।

পুলিন ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে পড়ে। লেনিনের বা বিদেশী সাম্যনীতির ওই একটা কথা তার মনে অনেক সাহস যুগিয়েছে—To each according to her needs. যার যা প্রয়োজন তাকে তাই পেতে হবে। রেণুর জীবনে তার প্রয়োজন ছিল। আজ ফুরিয়ে গেছে। সুতরাং তাকে তো দোষ দেওয়া যায় না।

অভিমানে আত্মহারা হয়ে সে কেবল তার প্রয়োজনটার কথাই চিন্তা করেছিল কিন্তু রেণুর দিকেও কিছু বলবার থাকতে পারে। সে কথাটাও তার ভাবা উচিত ছিল। চাবুকের ওপর চাবুক পড়তে লাগলো যেন পুলিনের পিঠে। রেণু কি তাকে নিয়ে সুখী হতে পারে না? যদি না পারে? তাতে অভিযোগ করবার কি আছে?

রেণু প্রশ্ন করে—কি ভাবছো পুলিন? বড় আঘাত পেলে, নয়? আঘাত পাওয়াই তোমার মতন ছেলের সম্ভব। প্রতি-হিংসায় তোমরা বাইরেটাকে বদলাতে চেয়েছ, কিন্তু ভেতরটাকে বদলাতে পার নি। তাই তোমরা এত চট্ করে আঘাত পাও। I pity you gentleman. তোমার দুঃখে সত্যি আমার দুঃখু হচ্ছে।

পুলিন বলে—রেণু, তুমি কি আমায় ভালবাস নি কোনদিন?

রেণু জবাবে বলে—দেখ, এই ভালবাসার অর্থ নিয়েই যত গণ্ডগোল। ভালবাসা মানে ভাল থাকবার জায়গা? তা তো

আমাদের ছিল। আজও ভেবে দেখ, অশান্তি তো সেখানে কখনও হয় নি। প্রয়োজনের খাতিরেই আমরা 'ভালবাসা' বেঁধেছিলাম। আজ প্রয়োজনের খাতিরেই তা ভেঙে যাচ্ছে। তাতে দুঃখ পাবার কিছু নেই।

পুলিন প্রশ্ন করে—কি কারণে ?

একটু চুপ করে থেকে রেণু বলে—যদি কৈফিয়ত চাও তার জবাব আমি দেব না। তবুও বন্ধুত্বের খাতিরে বলছি, তোমার আমার পথ স্বতন্ত্র। শুধু খাওয়া-পরা নিয়ে আমি বাঁচতে চাইনে। আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম বড় হব বলে। গত পাঁচ ছ' বছর তোমার সঙ্গে কাটালাম। তোমার যা দেবার তা তুমি দিয়েছ। আজ তুমি ফুরিয়ে গেছ। দেবার আর কিছুই নেই তোমার। তুমি রিক্ত, তুমি শূন্য। আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে ফুটো কলসীকে কেউ বুকে চেপে রাখে না পুলিন। তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে প্রয়োজন পূর্ণ কলসী। সে-ই মানুষকে যোগায় জীবনের স্পন্দন, নতুন শক্তি! শূন্য কলসী তা পারে না। তাই তার স্থান হয় আঁস্তাকুড়ে। আমার আজ প্রয়োজন ওই শেঠজীর মত লোক—যারা আমাকে দিতে পারে বাড়ি, গাড়ি, প্রভূত অর্থ আর সম্মান। সরকারকে প্রভাবিত করে একটা উঁচু পদেরও এরা সৃষ্টি করে দিতে পারে। কিন্তু তুমি ? তুমি কি পারবে দিতে ?

পুলিন বলে—দেখ, 'ভালবাসা' বলতে আমি ভাল বাড়ি মানে করি নি। আমি মানে করেছিলাম পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ। যে আকর্ষণে মানুষকে যুগ যুগ ধরে বেঁধে রেখেছে মানুষের কাছে।

রেণুর মুখে আবার সেই বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো। সে বললো —আকর্ষণ ? আমার প্রতি তোমার যা আকর্ষণ ছিল সে আকর্ষণ কি আজও আছে ? তুমি যদি বল—আছে, বুঝব তর্কের খাতিরে বলছ। কারণ, না-পাওয়ার যে আকর্ষণ মানুষের জীবনে থাকে পাওয়ার

মাঝখানে সে আকর্ষণ কখনই থাকতে পারে না। সুতরাং বন্ধু, অনেক রাত্তির হয়ে যাচ্ছে, এসব যুক্তিরও শেষ নেই, কোন কিছু ধরে বসে থাকবার মেয়ে আমি নই। আর যদি ভাব, ভালবাসা মানে জীবনের পঙ্গুতা, তোমার ধ্যানেতে জীবন কাটাবো তাহলে তুমি ভুল করেছ। তাহলে আমার স্বামী মারা যাবার পর আমি বসে থাকতেই পারতাম —এত পরিশ্রমের কোন প্রয়োজন হতো না। জানবে এগিয়ে চলাটাই জীবন। থেমে যাওয়াটা জীবনের চিহ্ন নয়। সুতরাং আমি এগিয়ে যাবই। শেষ অবধি দেখতে হবে এতে কি আছে। শোন একটা কথা বলি—এইরকমই একটা কিছু ঘটবে আমি আশাই করেছিলাম। সেইজন্যে কাল গ্রেট ঈস্টার্ন হোটেলে একটা চায়ের পার্টির ব্যবস্থাও আমি করেছি। সেখানে আমাদের আইনসংগতভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। কোর্টের আশ্রয় আমি নেব না, কারণ তাতে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি আছে। এক লহমায় যেমন আমাদের বিয়ে হয়েছিল, এক লহমাতেই তা ভেঙে যাবে।

কথা শেষ করে রেণু উঠে পাশের ঘরে যেতে যায়। যাবার সময় বলে—যাক, আজ বোধ হয় আমার সঙ্গে শুতে তোমার ঘৃণা হবে। তাই অনুরোধ আর করব না। তুমি এই ঘরেই থাক, আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি।

পুলিন বলে—রেণু, বিবাহ বিচ্ছেদের অভিনয়টুকু করে লাভ ?

রেণু দাঁড়িয়ে পড়ে বলে—বাঃ, করতে হবে না ? লোকে এতদিন ধরে জানতো আমি তোমার স্ত্রী। তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি। সেটা লোককে জানাতে হবে না ? নইলে, লোকে ভাববে আমি আজও তোমার জন্যে পথ চেয়ে বসে আছি। তাছাড়া আমি যদি কারুর সঙ্গে মিশি দুর্নাম রটবে যে ! প্রয়োজনের খাতিরে আবার স্বামী স্ত্রীর অভিনয় করতে হবে। কিন্তু আর নয় বন্ধু ! রাত দুটো বাজে। শুয়ে পড়। শরীর খারাপ হবে। কাল থেকে তোমায় দেখবার

কেউ নেই।—বলে, জড়িত কণ্ঠে গাইতে গাইতে চলে গেল—ওরে এগিয়ে চলার ছন্দ, আমায় দিল আনন্দ।

পুলিন একা। তার মনে হলো নারীজাতি কি অবিশ্বাসিনী! কেমন ঘর বাঁধলো! প্রয়োজনের তাগিদে জীর্ণ বসনের মতন তা ফেলে গেল। আবার নতুন ঘর বাঁধবার আশায় ছুটে গেল। রেণুকে সে চোখের ওপর দেখলো। শর্মিলাও বোধ হয় এরই জুড়ি। সেও নতুন কিছুর আকর্ষণে তার বাবার সংসার ফেলে যেতে পিছপা হলো না। কি বিচিত্র এদের মন!

পরমুহূর্তে তার মনে হলো, কিন্তু পুতুল তো এমনটি নয়! তার বাবার সঙ্গে তার যে সম্বন্ধই থাক, সে তো ছুটে এসেছিল তাকে সেবা করতে। পরমুহূর্তেই তার মনে হলো বোধ হয় সে এসেছিল টাকার লোভে। কিন্তু যখন তার টাকা ছিল না, তখনও সে তো ঠিক এমনি করে ছুটে আসতো। কখনও তো পিছপা হয় নি!

মনে পড়ে গেল তার যখন কিছুই ছিল না সে সময়ের কথা। তখন পঞ্চাশটা টাকা কলকাতায় আসবার সময় সে দিয়েছিল। পুলিন ফেরত দিতে চেয়েছিল।

তখন সে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল—রোজগার করলে ফেরত দিস। কলকাতায় এসে সে ভুলেই গিয়েছিল সেই কথা। তারপর যে ব্যাপার ঘটে গেল পুলিনের মনে আজ প্রথম তার জন্যে অনুতাপ হলো।

বুকের ভেতর আবার সেই গুরুভার যেন পাষাণ হয়ে বসলো। কিছুতেই যেন সে আর নামতে চায় না।

ঘর থেকে সকালবেলায় পুলিন যখন বার হলো, তখন দেখে পাশের ঘর থেকে তার আগেই রেণু কোথায় উঠে চলে গেছে। যে

লোকটি রান্নাবান্না করতো তাকে পুলিন জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো, রেণু ভোরবেলায় চা খেয়ে কোথায় বেরিয়ে গেছে। যাবার সময় তার হাতে দুটো টাকা দিয়ে বলে গেছে—তোর সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হবে না। এটা তুই রাখ। আর এই চিঠিখানা তোর বাবুকে দিস। তাতে লেখা ছিল ঃ—

প্রিয় বন্ধু পুলিন,

আমাকে বিশেষ কাজে আজ সকালেই বার হয়ে যেতে হলো। তোমার সঙ্গে দেখা হলো না বলে কিছু মনে কর না। তোমাকে ধরে এগিয়ে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু বুঝলাম জীবনের ধাক্কা তুমি সহ্য করতে পারবে না। প্রথম চোটেই তুমি পড়ে গেলে। দ্বিতীয়তঃ পার্টিকে তুমি ভালবাস। যে কোন কারণেই হোক, তুমি এর আদর্শ ছাড়তে পার না। ছেড়ে করবার মতন কাজও তোমার নেই। তাই তোমাকে ছাড়তে আমি বাধ্য হলাম। খালি তোমাকে নয়, এ পার্টিকেও ছাড়লাম। কারণ অনেক ভেবে দেখলাম, যারা নিজেরা বঞ্চিত হয়ে প্রতিহিংসা নেবার প্রয়াসী হয়েছে, তারা আমার মতন বঞ্চিতাকে জীবনের পথে এগিয়ে দিতে পারবে না। এ যেন একদল ক্ষুধার্ত শ্বাপদের সামনে একটুকরো মাংস ফেলে দেওয়া। তাদের নিজেদের পেট আগে ভরুক, তারপরে তারা অপরের পেট ভরাবে। পার্টি থেকে আমার পদত্যাগপত্র এই চিঠির সঙ্গেই তোমাকে দিলাম। পার্টির অফিসে দিয়ে দিও। তাদের বল, তাদের কাজ করতে আমি অসমর্থ। আজকের বিকেলের টি-পার্টিতে উপস্থিত থেকো—এইটুকুই আমার শেষ অনুরোধ। ইতি—রেণু

পুলিন একবার ভাবে সে বিকেলে যাবে না। কিসের জন্য যাবে ? কি সম্পর্ক তার সঙ্গে ? যেটুকু ছিল তা মিটে গেছে কাল রাত্রে। কিছু না খেয়েই সে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ঘুরতে লাগলো রাস্তায় রাস্তায়। অবশেষে গেল পার্টির অফিসে। সেখানে রেণুর পদত্যাগপত্রটা জমা দেওয়া দরকার।

কিন্তু পার্টির অফিসে গিয়েই সে বিস্মিত হলো। রেণু ইতিমধ্যেই এসে বিকেলের টি-পার্টিতে সকলকে নেমন্তন্ন করে গেছে। এমনকি প্রহ্লাদদাকেও সে বাদ দেয় নি।

কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলেছে—বিয়ের নানা দিক আছে। এ তারই একটা উৎসব। হাসিমুখে সে সকলকে জানিয়েছে—আসবেন কিন্তু, আসা চাইই। না এলে দুঃখ পাব।

পুলিন ভাবে রেণু কি অদ্ভুত মায়াবিনী ! সে যাবে না এ সভায় তবুও সে রেণুর পদত্যাগপত্রটা প্রহ্লাদদাকে দেবার জন্যে তাঁর ঘরে ঢোকে !

প্রহ্লাদদা বলেন—কি পুলিন, তোর কি কোন অসুখ করেছে ?

পুলিন বলে—আজ্ঞে না।

—তবে তোর মুখ-চোখ এত শুকনো কেন রে ?

পুলিন বলে—শুকনো ? কই, তেমন তো কিছু বোধ করছি না !

প্রহ্লাদদা তাকে বলেন—আজ রেণু আমাকে নেমন্তন্ন করে গেল, কি ব্যাপার বল্ তো ?

পুলিন মুখে কথা না বলে তাঁর দিকে পদত্যাগপত্রটা এগিয়ে দেয়।

সেখানা পড়ে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিয়ে প্রহ্লাদদা বলেন—বুঝেছি, আমার আশঙ্কাই সত্যি। ইদানীং ও শেঠজীর সঙ্গে খুব মেশামেশি করছে। ওর উচ্চ আশা ! Well ! বলবার আমার

কিছুই নেই। সরকারী একটা বড় পদ ও চায়! তুই পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারিস নি, তাই তোকে তার ছাড়তেই হবে। নইলে ওখানে সে আসন পাচ্ছে না! তাই বোধ হয় এখানেই প্রকাশ্যভাবে তোদের বিবাহ বিচ্ছেদ হবে।

পুলিন মাথা নীচু করে থাকে। জবাব দেয় না।—দেবার আছেই বা কি?

—Very sad my boy! তবে কি জানিস don't be sentimental. মনের কোমল বৃত্তিগুলোকে কখনও প্রশ্রয় দিস না। তাহলে দেখবি তুই দুর্বল হয়ে পড়বি। রাজনীতিতে দুর্বলতার স্থান নেই। এই দেখ্, স্ট্যালিনের জীবন তো পড়েছিস, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তাঁদের ত্যাগের কথাগুলো চিন্তা কর। ভেবে দেখ তাঁর চোখে কেউ কোনদিন জল দেখে নি। এই প্রসঙ্গে তোকে আর একটা কথা বলি, কামাল পাশার কথা। নিজের বন্ধুবান্ধব কাউকে তিনি ক্ষমা করেন নি কোনদিন। সারা রাত্তির যাদের সঙ্গে বসে মদ খেয়ে কাটিয়েছেন তাদেরই সকালবেলায় গুলি করে মারতে পাঠিয়ে দিয়েছেন গুপ্তঘাতকদের। স্ট্যালিন আর ট্রট্স্কীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল, ট্রট্স্কী দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু অন্য রাজ্যে গিয়েও কি স্ট্যালিনের হাত থেকে সে রেহাই পেল? মৃত্যু তার এল হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে।

তুই শিক্ষিত ছেলে, নতুন করে এসব কথা তোকে বোঝাবার কিছুই নেই। রেণুর মত সঙ্গিনী তুই বহু পাবি। যাক, আমার পক্ষে বিকেলে থাকা হয়তো সম্ভব হবে না। তুই থাকবি তো?

পুলিন বলে—আমি থেকে কা করব?

—তুই যদি না থাকিস ওই ধনকুবের শাইলকগুলো মনে করবে রেণুকে দিয়ে তারা তোকে চমৎকার ঘা দিয়েছে। শুধু তোকে নয়, আমাদের পার্টিকেও। যার ফলে তুই আর মাথা তুলে দাঁড়াতে

পারবি না কোনদিন। সেখানে থেকে তুই বুঝিয়ে দে যে তুই, yes, তুই দুর্বল নস্—তোর হৃদয় অত সহজে মুষড়ে পড়ে না। Out and out you are a revolutionary.

পুলিন বোঝে কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে। কিন্তু সে ভাবে, যে রাজনীতির মধ্যে হৃদয়বস্তুকে বিসর্জন দিতে হয়, সে রাজধর্মের মধ্যে নীতির স্থান কোথায়? সে কাজের মধ্যে থেকে তার লাভ?

শর্মিলাকে সে যদি স্ত্রীরূপে পেত, তাহলে এমনটি হতো না। কিন্তু যারা শর্মিলাকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিল, তাদের সে ক্ষমা করবে কি করে? না, করতে পারে না—কখনও করবে না।

সে যাবে। এই দলের সঙ্গে যখন সে মিশেছে, তখন তাকে দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত এরা কোথায় তাকে নিয়ে যায়। ধাপে ধাপে সে পাতাল অবধি নেমে যাবে—নিজের হৃদয়কে জ্বালিয়ে সে দেখবে সেখানে কি আছে,—তার মত লোকের স্থান আছে কি না! যা নেই তোমাদের ওই পুরনো সমাজে।

পুলিন কমরেড প্রহ্লাদদাকে অভিবাদন করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

ঠিক বিকেল চারটেয় পার্টি শুরু হয়। পুলিন যখন সেখানে পৌঁছোয়, দেখে, পার্টির অনেকেই তখন এসে পড়েছে।

রেণু একটা গোলাপী রঙের জাপানী জর্জেট পরে মাথায় ফুল গুঁজে সকলকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করছে।

পুলিনকে দেখেই সে অভিযোগের সুরেই বলে উঠলো—এই যে কমরেড পুলিন! বলি, এত দেরিতে কখনও আসতে হয়? বলি, কাজটা কি আমার একার? তোমার কি কোন দায়িত্বই নেই এতে? বলে, যার বিয়ে তার হুঁশ নেই পাড়াপড়শীর ঘুম নেই!

হঠাৎ এ কথার কোন জবাব পুলিনের মাথায় এলো না। ভদ্রতা বাঁচাতে সকলকার সামনে সে খানিকটা হাসবার চেষ্টা করলো। তাদের মধ্যে যদি কেউ বুঝতে পারতো, তাহলে সে বুঝতো এটা হাসি নয় কান্নারই নামান্তর মাত্র। মুখটা সামান্য বিকৃত হলো, এই পর্যন্ত।

পুলিন দুরুদুরু বুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে বসলো। সে কেবলই ভাবতে লাগলো কি ঘটে এর পর !

প্রহ্লাদদা আসেননি। তার বদলে কমরেড ডাঃ গোপালদা সভাপতির আসন নিলেন। বক্তৃতা হলো। সকলে বিস্মিত হলেন আজকের অনুষ্ঠানের কারণ কি জানতে না পেরে। রেণুকে সকলে অনুরোধ করলো আজকের অনুষ্ঠানের কারণ বলতে।

তখন রেণু পুলিনকে চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে এলো সভাপতির কাছে। তারপর নিজেই ঘোষণা করলো, জীবনের প্রয়োজনে তারা একদিন মিলিত হয়েছিল, কিন্তু এখন থেকে তাদের জীবনে সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই বলে কেউ মনে যেন না করেন, তাদের মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না—ঝগড়া বা অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। তা মনে করলে তাঁরা ভুল করবেন। তাদের বন্ধুত্ব আগেকার মতনই আজও অটুট আছে এবং আগামী দিনে তা তেমনই থাকবে। পুলিনের পদবী ত্যাগ করে রেণু আবার ফিরে যাচ্ছে সেই রায় পদবীতে। বিয়ে মানুষ-মাত্রেরই প্রয়োজন। তাই বলে বিয়ে আর বিচ্ছেদকে ঘিরে যে সমস্ত কুসংস্কার দেশের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে, তা মানতে সে প্রস্তুত নয়। সংস্কারমুক্ত তারা। সেইজন্যই সে বেছে নিয়েছে জীবনের এই সোজা পথটা।

কথা শেষ করে রেণু সাতবার পুলিনকে প্রদক্ষিণ করে।

সকলে রেণুর কথা শুনে হাততালি দিল। সাধুবাদ করলো। রেণু পুলিনের হাত ধরে আবার চেয়ারে এসে বসলো।

নতুন সমাজের মানুষদের মধ্যে কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া উত্তেজনাপূর্ণ হলো না। সভা নিস্তব্ধ হলো। সকলেই গম্ভীর। কারুর মুখে কোন কথা নেই।

একে একে সকলেই সভা ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচেন। কমরেড গোপালদার বক্তৃতা এই ঘটনার পর যেন একটা প্রহসনের মত শোনালো।

সভার শেষে পুলিন তাড়াতাড়ি রেণুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু রেণু যেতে দিল না। সব শেষে তাকে বললো—তোমার সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হবে না। তবু তোমাকে বলছি—তুমি যা চাও, তা বোধ হয় এতে পাবে না। যদি পার, এ পথ ছেড়ে দিও।

পুলিন একটু ঢোক গিলে কথা এড়িয়ে গিয়ে তবুও বলে—আমাদের ব্যাঙ্কের টাকাটা কি হবে?

হেসে রেণু বলে—এ মাসটা চলবার মতন সংসার খরচের টাকা আমি তোমার আলমারিতেই রেখে এসেছি। বাকী জমানো টাকা, গৃহিণী সংসারের খরচ থেকে বাঁচিয়েছিল। সুতরাং সেটা তারই প্রাপ্য।

পুলিনের মন ঘৃণায় রিরি করে ওঠে।

জবাবে সে বলে—এটা আমার জানা ছিল না।

আচ্ছা, বিদায়—বলে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে।

একটু হেসে রেণু বলে—পুওর চ্যাপ্!

কাহিনী বোধ হয় এইখানে শেষ হয়ে গেলে ভাল হতো, কিন্তু তা হলো না। পুলিনের আর কিছুই ভাল লাগে না। তবুও তাকে উঠতে হয়, তার নিজের জন্যেই তাকে আবার কাজে যেতে হয়। কারণ জমানো সব টাকাই রেণু আত্মসাৎ করেছে।

বাড়ি সে ছেড়ে দিয়েছিল। ফিরে গিয়েছিল শেয়ালদায় তার সেই পুরনো হোটেলটায়, যেখানে রেণু তার কাছে প্রথম এসেছিল।

অদ্ভুত মানুষের মন। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে পুলিনের মন মেতে উঠলো প্রতিহিংসায়। যে করে হোক এ অবিচারের প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। তার মনে হলো সমাজের ওই পুঁজিবাদীদের জন্যে তার জীবন এইভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তার কাছ থেকে রেণুকে কেড়ে নিয়েছে ওই বড়লোকেরা। যাদের আছে কেবল টাকা। কেবল তারই জোরে তারা মনে করে যেন সমস্ত পৃথিবীটাকে পা দিয়ে দলে চলার অধিকার তাদের আছে। তাদের সে ক্ষমা করবে না।

এদিকে ভারতে এলেন চৌ-এন-লাই। সমস্ত ভারতের লোক একসঙ্গে বলে উঠলো—হিন্দী চীনী ভাই ভাই। কিন্তু এই 'ভাই ভাই' পুলিনের কাছে একটা নতুনত্ব এনে দিয়েছিল।

অন্য বিদেশী যাঁরা ভারতে এসেছেন, তাঁরা ভারতের সব জিনিস গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ইনি তা করলেন না। ইনি ভারতের অতিথি হলেন বটে, কিন্তু দেশ থেকে বয়ে আনলেন তাঁর প্রয়োজনীয় সব কিছু।

প্রহ্লাদদার মত দু'চারজন লোক তাঁর সঙ্গে দিল্লীতে সাক্ষাৎ করলো। কিন্তু কি কথা হলো পুলিন তার খবর রাখলো না।

এর পরেই তিব্বত চীনের দ্বারা হলো আক্রান্ত। পাঞ্চেন লামাকে প্রধান করে চীনারা দালাই লামাকে করলো আক্রমণ। দালাই লামা প্রাণটুকু সম্বল করে ওই নেফার পথে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলেন ভারতবর্ষে। শোনা গেল চীনাদের লক্ষ্য ছিল দালাই লামার জমানো সোনার ওপর। সেই সোনা তিনি নাকি পথে পুঁতে রাখলেন। যতখানি সম্ভব ততখানি সঙ্গে নিয়ে এলেন।

পুলিন ভাবলো কেন ওঁকে চীনারা রিক্ত করে দিল না। এই সব ধনকুবেরগুলো আছে বলেই পৃথিবীতে এত অসাম্য। কবে ওরা দলে দলে ধ্বংস হবে! সমান করে সকলে আবার ওরা ধনসম্পদ ভাগ করে নেবে।

এবার চীন এলো ভারতের দরজায়। উত্তর-পশ্চিমের লাডাক আর উত্তর-পূর্বের নেফা সীমান্তে। কিন্তু ভারত সরকার ভাবলেন চীন সাম্রাজ্যবাদী নয়। চীনের সমর্থকরাও রটিয়ে মানুষের মনে একটা ধারণার সৃষ্টি করে দিলে যে, কোন সোসালিস্ট দেশ পরদেশ আক্রমণ করে না, করতে পারে না। তাই ভারতবর্ষের ওপর কোন আক্রমণ হতে পারে এমন কোন প্রশ্নই তাঁদের মনে এলো না। এজন্যে আত্মরক্ষারও কিছু ব্যবস্থা তাঁরা করলেন না। ভারতবর্ষ যেমন চলছিল তেমন চলতে লাগলো।

পুলিনের সংবাদপত্রের কাজও সেই একই রকম। নতুনত্বের সন্ধান আজও কিছু এলো না।

এসে পড়লো নির্বাচন। যথারীতি শুরু হলো ভোটযুদ্ধ। নির্বাচনের শেষে দেখা গেল পুলিনের দল এবারেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। তার ওপর সরকারের দল, ঠিক নির্বাচনের আগেই পোর্তুগীজদের হাত থেকে ভারতের শেষ উপনিবেশ-গুলিকে মুক্ত করেছে। দেশের লোকের বিশ্বাস এখনও তাদের ওপর অটুট আছে।

সখেদে প্রহ্লাদদা একবার পুলিনের কাছে বললেন—এ দেশের লোককে জাগাতে চাইলেও তারা জাগবে, না, যেন কুম্ভকর্ণের বংশধর! নিজের ভালমন্দ এরা বোঝে না। তবে একটা আশার আলো এই, সরকারী প্রতি অফিসে অফিসে আমাদের প্রচুর লোক ঢুকে পড়েছে। প্রয়োজনের সময় তারা অন্য মূর্তিতে দেখা দিতে পারবে। এখন দেখা যাক, কি হয় শেষ পর্যন্ত।

পুলিনদের দল যখন বৈদেশিক সাহায্য লাভের আশায় নানা গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তখন চীন ভারতের সীমারেখা লঙ্ঘন করতে শুরু করেছে। পণ্ডিতজী প্রথমটা ভেবেছিলেন এটা ভুল করে হচ্ছে। সীমান্তরক্ষীদের ওপর গুলি চললো। হুঁশিয়ার-বাণী ঘোষণা করতে লাগলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

পুলিনের দলও ভেতরে ভেতরে ঘোষণা করতে লাগলো মুক্তিফৌজের আগমনকথা। "ওরা আসছে অবহেলিত ভারতবর্ষকে মুক্তি দিতে"—এই হলো তাদের একমাত্র বাণী।

এর মাঝে এসে পড়লো ২০শে অক্টোবর। প্রকাশ্যভাবে সৈন্য নিয়ে চীনারা নেফা আক্রমণ করলো। শুধু নেফায় নয়, তারা লাডাকেও সীমান্তরেখা ছিন্নভিন্ন করে ভারতবর্ষের মধ্যে এগিয়ে এলো। এর আগে থেকেই হাতে হাতে চীনা দূতাবাস থেকে বহু মানচিত্র পাওয়া গিয়েছিল যাতে দেখানো হয়েছিল সারা হিমালয়টা চীনাদের রাজ্যভুক্ত।

ভারতের জনগণ কিন্তু চিৎকার করে উঠলো—আক্রমণ ঠেকাও! এ অত্যাচার আমরা সহ্য করব না।

সরকার বললেন—শেষ অবধি আমরা যুদ্ধ করব। ভারতীয় সৈন্য ছুটলো সীমান্ত বাঁচাতে। ফিরে যাও সীমান্তের ওপারে। দেশের চেহারা যেন রাতারাতি বদলে গেল।

নেহরু সারা বিশ্বদরবারে আবেদন জানালেন—আমরা অপ্রস্তুত। আজকের দিনে সভ্যজগতে আমরা ভাবতেও পারি না, কেবল রাজ্য বাড়াবার লোভে কেউ অপরের রাজ্য আক্রমণ করতে পারে।

জবাবে পিকিং রেডিও বললো—পণ্ডিতজী ভুল করে ভারতীয় সৈন্যদের এগিয়ে দিচ্ছেন আমাদের হাতের কাছে। আমাদের কাজে ওরা বাধা দিচ্ছে। সুতরাং আমাদের সে বাধাকে ঠেলে

যেতে হবে। এই সমস্ত সৈন্যদের মৃত্যুর জন্য দায়ী তাদের প্রধানমন্ত্রী।

দেশের লোক তার প্রত্যুত্তরে বললো—অনেক কষ্টে আমরা বিদেশীর কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছি। সে স্বাধীনতা আমরা হারাতে পারব না। আমরা প্রাণ দেব—মান দেব না। পরাধীনতার শৃঙ্খল আর আমরা পরব না। দেশের মধ্যে নতুন সাড়া জাগলো। বীর যুবকরা এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধে নাম লেখালো।

কিন্তু অস্ত্র কোথায়? আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র? যা নিয়ে প্রবলবেগে চীনারা ভারতের মধ্যে প্রবেশ করে আসছে?

ইংলণ্ড, আমেরিকা বললো—আমরা অস্ত্র দেব। সেকথা শুনে দেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলো। এসে পড়তে লাগলো ভারে ভারে আধুনিক ধরনের আত্মরক্ষার উপকরণ।

কিন্তু তার আগেই চীনারা একটার পর একটা আমাদের ঘাঁটি দখল করতে লাগলো। ওরা বোধ হয় ভেবেছিল, এভাবে শোচনীয় পরাজয় হলে ভারতবাসীর মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকবে না, তারা নিজেরাই আত্মসমর্পণ করবে। তাওয়াং, সে-লা, বমডিলা ওরা দখল করলো। জোওয়ানরাও সেখানে যুদ্ধ করলো বীরের মতন। কিন্তু অস্ত্র অভাবে তারা চীনাদের ঠিকমত উত্তর দিতে না পেরে পেছু হঠতে বাধ্য হলো।

যখন চীনাদের আক্রমণে ভারত বিপর্যস্ত হয়ে পিছু হঠছে তখনও পুলিনের দল বলছে—চীন আক্রমণ করেনি। চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু বরফের পাহাড়ের উপর কি হচ্ছে তা কে জানে! চীনরাজ্য অন্য দেশ আক্রমণ করতে পারে না।

এবার তাদের দলের ভাঁওতায় দেশবাসীরা আর ভুললো না। তারা উত্তেজিত হয়ে উঠলো তাদের দলের বিরুদ্ধে।

তার ফলে সমস্যার গতি অন্যদিকে মোড় ফিরলো।

পুলিনের দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দিল।

তারা একদল হলো চীনা সমর্থক, আর একদল বললো স্বাধীনতার বিনিময়ে রাষ্ট্রবিপ্লব আমরা চাই না।

পুলিনদের অফিসে রাত্তিরবেলায় গোপন অধিবেশন হলো। সকলকার মুখই গম্ভীর।

প্রহ্লাদদা বললেন—দেখ, আজকে রাত্তিরে যে আমরা ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়েছি, এর দুটো কারণ আছে। চীনকে নেফা অঞ্চলে বা লাডাকে কেউ রুখতে পারবে না। তার কারণ গত তিন বছর ধরে তারা নিজেদের তৈরি করেছে। ওরা ওদের দেশের মেয়েদের ছেড়ে দিয়েছিল নেফাবাসীর হাতে। তারা বধূ হয়ে ঢুকেছে ওসব অঞ্চলের ঘরে ঘরে। তারা চীনাদের জানিয়ে দিয়েছে পাহাড়ের গোপন রাস্তা। তার ফলেই চতুর্দিক দিয়ে তারা ভারতবাসীকে আক্রমণ করতে পেরেছে। এর পরে ওদের নামতে হবে সমতলভূমিতে। সেখানে কিন্তু এত সহজে ব্যাপারটা মিটবে না।

গোপালদা বলেন—ব্যাপারটা যে এমন হবে তা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। আমরা ভেবেছিলাম, চীনারা এগিয়ে এলেই আমাদের দেশবাসী তাদের অভ্যর্থনা জানাবে। তখন আমরা ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতা অধিকার করব। কিন্তু—

প্রহ্লাদদা বলেন—যারা একদিন আমাদের জয়গানে মুখরিত হতো, তারাই এখন নানা জায়গায় আমাদের পার্টির অফিস পুড়িয়ে দিচ্ছে। আজ আমরা আখ্যা পাচ্ছি মীরজাফরের। খুব সম্ভব জনসাধারণের চাপে সরকার আমাদের বন্দী করবেন। যারা একদিন আমাদের বক্তৃতা শুনে হাততালি দিত, তারাই আনন্দে হাততালি দেবে আমাদের বন্দী হবার সংবাদে। এখন উপায়?

প্রফেসর চ্যাটার্জী বলেন—এতখানি যে হবে গোড়ায় তা

ভাবা যায়নি। আমি ভেবেছিলাম সরকারের ডাকে দেশের লোক সাড়া দেবে না। কিন্তু টাকাপয়সা তো দিচ্ছে! মেয়েরা গায়ের গহনা অবধি খুলে দিচ্ছে!

সেদিন রেডিওতে যেমন বলছে—রক্ত দিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্লাড ব্যাঙ্ক ভরে যায় রক্তদানেচ্ছু লোকেতে।

মেডিকেল কলেজ, কংগ্রেস ভবন, এমন কি তার সামনে ইনফরমেশন সার্ভিসেও সরকার তার শাখা খুললেন। সব জায়গায় ভিড়, ডাক্তারেরা রক্ত নিয়ে উঠতে পারে না।

ওরা বলে—কোন কিছুর বিনিময়েই আমরা স্বাধীনতা আর হারাতে পারব না।

এখন চীনের কাছে আমাদের মুখ থাকে কি করে?

প্রফেসর শর্মা বলেন—True, এটা ভাববার কথা।

প্রহ্লাদদা বলেন—তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, আমি খবর পেয়েছি সরকার ভারত রক্ষা আইনে খুব শিগগির আমাদের গ্রেফতার করবেন। ওঃ, কি ভুলই না করেছি! এদের কাছে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ভাবতাম এরা আমাদের দলের সমর্থক। এদের জয়ধ্বনিতে ভাবতাম সরকারের পরিবর্তন এরা চায়। তাই এরা আমাদের ভোট দিয়ে বিধানসভায় পাঠায়।

কমরেড গোপালদা বলেন—বিরোধিতা করেও সরকারের কাছ থেকে আমরা মাইনে পেতাম। সরকারের খরচায় আমাদের সংসার চলে যেত। এখন শ্রমিক আন্দোলন করেও আমাদের মন্দ আয় ছিল না। দেশের লোক যে এতখানি বেইমান হবে, এ তো আমি ভাবতেই পারিনি!

প্রহ্লাদদা বলেন—হতাশ হবার কিছু নেই, কমরেড গোপালদা! সরকার আমাদের ধরতে চান ধরুন, কিন্তু ছাত্রদলের মধ্যে, অফিসের কেরানীদের মধ্যে এমন বিষ আমরা ছড়াতে পেরেছি যাতে

সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টা যতটা সোজা হবে বলে মনে করেছিলেন ততটা হবে না। ক্ষমতা যদি আমরা না পাই, সে ক্ষমতা অপরকেও ভোগ করতে দেব না। নেফা, লাডাক, সর্বত্র চীনারা দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাঘাট তৈরি করেছে, প্রচুর খরচও করেছে তারা আমাদের দেশে। তাই এত সহজে ওরা ভারতবর্ষকে নিষ্কৃতি দেবে না। সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তাছাড়া চীনের চাই খাবার। দারুণ খিদে তার পেটে। তা তাকে ভরাতেই হবে। দেশের লোক যদি না বিশ্বাসঘাতকতা করতো, তাহলে ওই সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা কি এদেশে সমরোপকরণ পাঠাতে পারতো? শুনুন, দিল্লী থেকে আমাদের পার্টি খবর দিয়েছেন তাঁরা আমাদের সঙ্গে আর সহযোগিতা করবেন না। না করুন, দুঃখ নেই। তবে প্রচারকাজ আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে।

তবে শেষবারের মত বলছি আপনাদের কারুর হাতে যদি চীনের গোপন দলিলপত্র থাকে, তা সরিয়ে ফেলুন। আর একটা খবর আপনাদের বলি, খুব শিগগিরই কলকাতা আর বম্বের চীনা দূতাবাস বন্ধ হবে। তখন ওদের কাছ থেকে কিছু টাকা প্রচারকাজ চালাবার জন্যে আমাদের নিতে হবে। কে কে আমাদের হয়ে তখন কাজ করবেন তাঁদের নাম স্থির করে ফেলা দরকার।

পুলিনের নাম দলের মধ্যে প্রথম প্রস্তাবিত হতেই প্রহ্লাদদা বললেন—না, ওর অন্য কাজ আছে।

অনেক রাত্রে সেদিন সভা শেষ হলো। পুলিন ভাবে, তার জন্যে আবার নতুন কি কাজ রয়েছে?

একটু জিজ্ঞাসুনেত্রেই সে প্রহ্লাদদার কাছে যায়।

প্রহ্লাদদা তাকে ডেকে বলেন—পুলিন, এদিকে আয়, গোপনে তোর সঙ্গে কথা আছে।

পুলিন এগিয়ে যায়।

প্রহ্লাদদা তার হাত ধরে একটা চেয়ারে বসান। পরমুহূর্তে বলেন—রেণুর সঙ্গে তোর দেখা হয় ?

পুলিন বলে—না।

একটু চিন্তিতমুখেই প্রহ্লাদদা বলেন—দেখা হলেও তাকে বিশ্বাস করিস না। যুদ্ধ আরম্ভ হতেই পার্টির বহু গোপন খবর সে জানিয়েছে সরকারকে। সে চায় টাকা, পদমর্যাদা। সে বিষয়ে আমার তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই, কিন্তু মুশকিল বেধেছে অন্য জায়গায়।

পুলিন একটু বিস্মিত চোখে তাঁর দিকে চায়।

প্রহ্লাদদা বলেন—চীনাদের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি আমি করেছিলাম। সে চুক্তির আসল কথা ছিল এই তলে তলে আমি দেশের লোককে তৈরি করে রাখব চীনের পক্ষে। সেইজন্যে তারা বছরে বছরে আমাকে টাকাও সাহায্য করবে। ভারত অধিকারের পর ওরা আমাদের আর পার্টির সদস্যদের ওদের তত্ত্বাবধানে ক্ষমতা তুলে দেবে।

পুলিন বলে—তা কি ওরা দিত ?

প্রহ্লাদদা বলেন—দিতে বাধ্য হতো। না দিয়ে তাদের উপায় থাকতো না। যাক সেকথা। এখন তোকে একটা কাজের ভার দিয়ে আমি কি নিশ্চিন্ত হতে পারি ?

পুলিন বলে—জান কবুল !

প্রহ্লাদদা বলেন—ঠিক আছে। এই ফাইলটা তুই তুলে নে। যে কোন উপায়ে হোক, তোকে এখন যেতে হবে নেফায়। নেফাতে পৌঁছে, তোকে যেতে হবে বমডিলায়। সেখান থেকে কোনও চীনা জেনারেলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত করতে হবে। তাকে দিয়ে আসতে হবে এই দলিল। এরই মধ্যে আছে আমাদের ভবিষ্যতের কর্মপন্থার সূচী। সরকারী কোন লোকের হাতে পড়লে চিরদিনের মত আমাদের পার্টি পড়বে আবার ধ্বংসের মুখে। তাকে জাগিয়ে তুলতে আমাদের

জীবনে আর পারব না। কিংবা এই পরস্বাপহারী বিলাসী সরকার আমাদের রেখে দেবে চিরদিন যবনিকার অন্তরালে। আলোয় মুখ তুলতে আর কোনদিনই আমরা পারব না।—কথাটা বলতে বলতে একটা হতাশা প্রহ্লাদদার কণ্ঠকে আচ্ছন্ন করলো।

পুলিন সেই প্রথম দেখে প্রহ্লাদদার চোখে আর হিংস্র দৃষ্টি নেই। কেমন যেন একটা উদাস ভাব। সে স্তব্ধ। এ মানুষের ভেতরেও তাহলে ব্যথা আছে?

অনেকক্ষণ চুপচাপ। কারুর মুখে কোন কথা নেই।

প্রহ্লাদদা বলেন—দেখ পুলিন, তোর মত আমিও গরিবের ছেলে। ছেলেবয়সে বড়লোকদের জামাকাপড় আর গাড়ি দেখতাম। আর ভাবতাম—অমনটি আমার হয় না? বাবা বলতেন—কেরানীর ছেলের আবার ঘোড়ারোগ। ছা-পোষার সংসার, অনেকগুলো ভাইবোন। সংসার ছিল একরকম অচল রে। ওই রেণু তখন জন্মায়নি। ওদের পাশের বাড়িটাই ছিল আমাদের বাড়ি।

পুলিন বলে—আপনি রেণুকে চিনতেন?

—ঠিক রেণুকে নয়, রেণুর বাবাকে।

যাক সেকথা। বাবা তখন কলকাতায়। একটা অফিসে সামান্য কেরানীগিরি করেন। মা গেল মারা। সাত বছরের ছেলে আমি। সঙ্গে পাঁচটা ভাইবোন। গ্রামের লোকের দরজায় দরজায় ঘুরেছি সে রাত্তিরে। ঠাণ্ডার ভয়ে শীতের রাত্রে কেউ বেরুলো না রে!

সকালবেলায় তাদের সাহায্যে কোনরকমভাবে মা'র কাজ করি। চার দিন পরে বাবা এলেন বাড়িতে। শোকের বেগ না কমতেই বাবা করলেন আর একটা বিয়ে। লোককে বোঝালেন—নইলে সংসার চলে না। আবার বাবা ফিরে এলেন কলকাতায়। সৎমার অত্যাচার শুরু হলো। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম এর প্রতিশোধ নেব। অনিল নাম বদলে ফেলে

নাম নিলাম প্রহ্লাদ। দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ, সব কিছু নতুন করে গড়ব।

শহরে এসে স্কুলের সেক্রেটারির বাড়িতে চাকর হলাম। প্রথমটা তিনি দয়া করে স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিলেন। তারপর স্কলারশিপের টাকাতেই পড়াশুনা চালিয়ে এসেছি। কিন্তু দেখ, আমি যে চাকর একথাটা কিন্তু তাঁরা ভুলতে পারেননি কোন দিন। তারপর ছেলে পড়িয়ে স্কলারশিপের টাকায় বি. এ. পাস করলাম। স্কলারশিপের টাকা আর আমার সামান্য জমানো কিছু টাকা নিয়ে গেলাম বিলেতে। সেখানে থেকে শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরে এলাম অনেক আশা নিয়ে।

কিন্তু এখানে উপযুক্ত সুপারিশের অভাবে মনের মত কাজ জুটলো না। প্রতিজ্ঞা করলাম—এর প্রতিশোধ নিয়ে আমাকে বড় হতেই হবে। সরকারের সঙ্গে হাত মেলাতে গেলাম। সেখানে দেখলাম নিজের ভাগ্যের উন্নতির জন্যে আমার আগে সেখানে শত শত যুবক লাইন দিয়েছে। হয়তো এ জীবনেই আমার সুযোগ আর আসবে না। তাই বেছে নিলাম এই রক্তপিচ্ছিল পথ। ভাবলাম এতে হয় এদিক না হয় ওদিক হবেই।

খুঁজে খুঁজে দেখতাম, মানুষের দুর্বলতা কোন্ জায়গায়। তারপর জোরে সেইদিকেই আঘাত করবার চেষ্টা করতাম। বন্ধু সেজে ওদের সঙ্গে মিশতাম, ওদের উন্নতি করব বলে নয়, ওদের মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে মাথায় চড়ব বলে। দেশের লোক আমায় দেখেনি। আমার কি দরদ ওদের ওপর! কিন্তু সরকার সেটুকুও আমায় দিল না। হয়তো দু'চার দিনের মধ্যে আবার আমায় পুরবে কারাগারে। রং বদলাতে পারতাম, কিন্তু বদলালে চিরদিনের মত আমাকে আবার বশ্যতার জালে জড়িয়ে পড়তে হবে। তাই ও-ফাঁদে পা দেওয়া আর চলবে না। কিন্তু এই দলিলটা যদি

ওদের হাতে পড়ে তাহলে ফল সেই একই। আমার বড় হবার স্বপ্ন আবার মুছে যাবে। তাই আমি বিশ্বাস করি তোকে, পুলিন, আমার সম্মান তুই রাখবি।—

কথা শেষ করে তিনি একটা ফাইল এগিয়ে দেন পুলিনের দিকে।

পুলিন বলে—আমি কি করে তাদের চিনব প্রহ্লাদদা?

প্রহ্লাদদা বলেন—সেকথা বুঝি তোকে বলতে ভুলে গেছি? একটা লাল রুমাল রাখবি কাছে। চীনা সেনাপতির সামনে গিয়ে সেটা তিনবার নাড়বি। যদি দেখিস তিনিও তিনবার নাড়ছেন, তখন তুই উচ্চারণ করবি—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"।

তিনিও যদি এই কথাটা উচ্চারণ করেন তাহলে বুঝবি ঠিক লোকের কাছে এসে পড়েছিস।

বিস্মিত হয়ে গিয়ে পুলিন বলে—আপনি কবে এসব ঠিক করলেন?

হাসতে হাসতে প্রহ্লাদদা বলেন—তোর মনে আছে, কিছুদিন আগে বুদ্ধজয়ন্তী হয়ে গেছে আমাদের দেশে? তখন অনেক চৈনিক সন্ন্যাসী এসেছিল আমাদের দেশে। ওই গৈরিকবাসের অন্তরালে যারা এসেছিল, তারা কেউই সন্ন্যাসী নয়। সকলেই চীনা সৈন্যদলভুক্ত।

পুলিন স্তম্ভিত। সে প্রশ্ন করে—সে কি!

প্রহ্লাদদা বলেন—ওরে মুখ্যু, এ কথাটা ভাবিস না? যে দেশের সরকার ধর্ম মানে না, সে দেশ থেকে আসবে সন্ন্যাসী? তারা নিজেদের দেশে বাঁচে কি উপায়ে? ওরা এসেছিল ছদ্মবেশে ভারতবর্ষকে জরিপ করে যেতে। পথঘাট দেখে যেতে।

পুলিন বিস্মিত। সে বলে—তাহলে এ যুদ্ধের পরিকল্পনা—

প্রহ্লাদদা বলেন—বহুদিন আগে থেকেই চলছিল। যুদ্ধ হবেই,

কেউ ঠেকাতে পারবে না। কেবল শক্তি সংগ্রহ করবার জন্যে যেটুকু সময়ের দরকার সেটুকুর প্রয়োজন ছিল। এখন যা, যে করে হোক আমার কাজটা করিস। কিন্তু খুব সাবধানে। পুলিসের চোখ এড়িয়ে—মনে থাকে যেন। তোর ওপরেই নির্ভর করছে বাঙলাদেশের সমস্ত ভবিষ্যৎ। আমার অনুরোধ—এটাকে ডুবিয়ে দিস না ভাই।

পুলিন মাথা নাড়ে।

তিনি বলেন—এবারে আয়, আর নয়, ভোর হতে চললো।

পুলিন চলে আসে নিজের হোটেলে।

পুলিন ভেবে দেখে এই যুদ্ধের সময় ওদিকে যাওয়া যুক্তিসংগত হবে না। তাতে পুলিসের চোখে পড়ার সম্ভাবনা। তার চেয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করে যাওয়াটা সংগত মনে করলো।

মাঝখানে জটিদার সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল। তার মুখেই সে খবর পেয়েছিল, শতদলবাবু মৃত্যুশয্যায়। স্থলাল আর ব্যবসা দেখে না। মদেই ডুবে থাকে। দুলালের অবস্থা প্রায় সেই রকমই।

পুরানো কর্মচারীদের অনেকেরই জবাব হয়ে যাচ্ছে। ভায়ে ভায়ে মামলা বেধেছে। জটি দু'পক্ষই তদারক করছে। যদি কোন-রকমভাবে কোন পক্ষের দয়ায় তার চাকরিটাকে বাঁচাতে পারে।

পুলিন ভাবে এই তো এদের জীবন। এদের মুখে আবার বড় বড় কথা! পরের গোলামি করব না। স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়!

অথচ এরা গোলামের ছেলে গোলাম। জটির মুখেই সে শুনেছিল শর্মিলার তখনও কোন খবর পাওয়া যায়নি। তবে জটি এই কথাটাই তাকে জোর দিয়ে বলেছিল—আমার মনে হয় কর্তা তার খবর জানেন।

পুলিন একটু উৎসাহিত হয়েই বললো—তুমি কি করে জানলে ?

—ঠিক জানি না, তবে আমার অনুমান। কারণ তিনি আর তার নাম করেন না। খোঁজার চেষ্টাও আর দেখি না।

আলোচনাটা সেইদিন সেখানে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

প্রহ্লাদদা এবং দলের অনেক গণ্যমান্য লোক পুলিসের হাতে ধরা পড়লেন। ওদিকে যুদ্ধের অবস্থাও শান্ত হয়ে আসতে লাগলো।

বমডিলা অধিকার করে চীনারা আর এগুতে সাহস করলো না। তারা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে পিছু হটতে লাগলো। কারণ এখন ভারতীয় জোওয়ানরা মুখোমুখি জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

পুলিন ভাবে, এই হলো সুবর্ণ সুযোগ। যে কোন নেফাবাসী উদ্বাস্তুর দলে মিশে গিয়ে সে সোজা চলে যাবে ওই পাহাড়ের ওপর। তারপর এক চৈনিক সেনাপতি বার করতে কতক্ষণ! এই ভেবে সে যাত্রা করলো আসাম অঞ্চলে।

জলপাইগুড়ি অবধি সে ভালই গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হলো, প্রতি স্টেশনে যেন পুলিসের গোয়েন্দা তার ছায়া অনুসরণ করে চলেছে। রাত গভীর। এখন সে যায়ই বা কোথায় ?

সে একটা অচেনা স্টেশনে নেমে পড়লো। নাঃ, সে বোধ হয় পুলিসের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পেরেছে। কারণ তার গায়ে ছিল মিলিটারী পোশাক। ওপথে চলার পক্ষে তার মনে হয়েছিল, এই পোশাকটাই তাকে রক্ষা করতে পারবে। প্রয়োজনমত পোশাক বদলালেই হবে।

কিন্তু এত রাত্তিরে সে যায় কোথায় ? সকালের জন্যে অপেক্ষা করবে ? নাঃ, দিনের আলোয় তার কাজের সুবিধা হবে না। এসব কাজ রাতের অন্ধকারে হলেই ভাল হয়। ছোট স্টেশন। গাড়ি বলতে কিছুই পাওয়া গেল না। সে শুনলো মোটর আসবে কাল

সকালে। তার চেয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি করে কোনও একটা বড় শহরে গিয়ে সেখানেই রাত কাটানো পুলিন স্থির করলো।

সেখান থেকে একখানা গাড়ি নিয়ে সকালবেলায় গৌহাটির দিকে যাত্রা করলেই হবে। দাঁড়াবার সময় নেই।

সেই উদ্দেশ্যেই সে একটা গাড়ি ভাড়া করে। তারপর রাত্রির অন্ধকারেই সে যাত্রা করে অনির্দিষ্ট পথে।

কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার শরীরের ভেতরের রক্তটা যেন জমে যাচ্ছিল। ক্লান্তিতে চোখ জুড়ে আসছে, কিন্তু তবু সে নিজেকে জোর করে জাগিয়ে রাখছে। বিশ্রাম নেবার সময় এটা নয়।

অন্ধকার রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক ও ঘোড়ার খুরের খপখপ আওয়াজ শোনা যায়।

এ কোথায় এলো সে? কতটাই বা তাকে যেতে হবে?

গাড়োয়ানের সঙ্গে বেশী কথা বলতে সাহস হয় না। পাছে কোন অসতর্ক মুহূর্তে মুখের কোন কথা বেরিয়ে যায়! সে এখন কি করবে?

ঠিক এমনি সময় তার সমস্ত চিন্তাজাল ছিন্ন করে তার গায়ে এসে পড়লো একটা তীব্র হেডলাইটের আলো।

পুলিন গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করে—এত রাত্তিরে কে যাচ্ছে গো?

গাড়োয়ান জবাবে বলে—সাহেব, আপনার সুবিধেই হলো, কোন মিলিটারী অফিসার বা পুলিস আসছে। গাড়ি দাঁড় করাব সাহেব?

সর্বনাশ! পুলিস! মিলিটারি! পুলিন সচকিত হয়ে দেখে নেয় পালাবার কোন রাস্তা আছে কিনা।

রাস্তার ডান দিকে প্রায় ন'দশ ফুট নীচে ধানক্ষেত। সেটা পার হতে পারলে ওদিকটায় একটা ডোবা।

তারপর অনেকগুলো ঝোপঝাড় আছে। ওটার একটার মধ্যে

আত্মরক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু যাবার আগে ওটা মিলিটারি না পুলিসের জীপ দেখা দরকার।

ঠিক এমনি সময় ওদিক থেকে আওয়াজ এলো—হল্ট্!

পুলিন গাড়োয়ানকে বলে—আরও জোরে চালাও, প্রচুর বকশিশ দেব।

বকশিশের লোভে গাড়োয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারে। আর ঠিক সেই অবসরেই পুলিন লাফিয়ে পড়ে ধানক্ষেতের মধ্যে। সে মনে মনে ভাবতে থাকে, পুলিস বা মিলিটারি যখন এসে গাড়ি ধরবে তখন সে ওই ঝোপটার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকবে।

ঠিক সেই সময় জীপ থেকে ওরা গুলি চালালো। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে শব্দ হলো—গুড়ুম—

পুলিনকে হয়তো ওরা দেখতে পায়নি। গাড়োয়ানও বুঝতে পারেনি পুলিন লাফিয়ে পড়েছে। বন্দুকের শব্দে ভয় পেয়ে ঘোড়া আরও জোরে ছুটতে লাগলো।

পুলিন নির্বিঘ্নে আত্মগোপন করলো গিয়ে ওই ঝোপটার আড়ালে।

কিন্তু জীপের সঙ্গে ঘোড়া কতক্ষণ ছুটতে পারবে! অবিলম্বে পুলিসের জীপ এসে ঘেরাও করলো গাড়িখানাকে। আরোহীর কথা জিজ্ঞাসা করায় গাড়োয়ান কিছুই বলতে পারলো না। সে শুধু বললো—সাহেব তো এইখানেই বসে ছিল, আমি তো দেখিনি!

পুলিস সন্দেহ করে গাড়োয়ানকে চালান দিল থানায়। খানিকটা এদিকওদিক খোঁজ করে তাকে না পেয়ে পুলিস চলে গেল থানায় রিপোর্ট করবার জন্যে।

রাত্রি বোধহয় তখন শেষ হয়ে আসছিল। ওখানে ওভাবে বসে থাকাও পুলিন যুক্তিসংগত মনে করলো না। সে বোঝে থানা থেকে

আরও কনস্টেবল এনে পুলিস এবারে ওই এলাকাতেই তার জন্য জোর অনুসন্ধান চালাবে। তখন আর বাঁচবার উপায়ও থাকবে না। তার চেয়ে বরং কাছেপিঠে কোন গৃহস্থের বাড়িতে আত্মগোপন করতে পারলে তার পক্ষে নিরাপদ হবে। কিন্তু এরকম সৈনিকের বেশে তো যাওয়া চলবে না। তাতে ফ্যাচাং বাধবে অনেক।

বোঁচকাটা খুলে সে বার করলো গেরুয়ারঙের একটা কৌপীন আর একটা গায়ের চাদর। ধুলোবালি খানিকটা গায়ে মেখে নিল। তারপর 'জয় মাধব' বলে বেরিয়ে পড়লো।

রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে তেমন সন্দেহজনক কিছু দেখলো না। একটা গল্পও সে মনে মনে তৈরি করে নিল। কারণ ভোর রাত্রে কড়া নাড়লে গৃহস্থ তাকে জিজ্ঞাসা করবে সে কোথা থেকে আসছে। তখন সে বলবে, সে যাচ্ছিল গৌহাটি, সেখান থেকে মায়ের স্থান কামাখ্যায় যাবার ইচ্ছে। টাকা ছিল না সঙ্গে। তাই রাত্তিরবেলায়ই চেকার গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে একটু আশ্রয়ের জন্যে সে এই পর্যন্ত চলে এসেছে।

চমৎকার দেশ এটা। এ দেশ এমনই দেশ, এখানে ভিক্ষে চাইলে পাওয়া যায়। কিছু না করেও অনায়াসে দিন কাটানো যায়।

নিজের মনেই সে হাসতে থাকে। আজ সন্ন্যাসীর ভেক ধরলে কেউ সন্দেহ করবে না।

পিছনে দূর থেকে যেন একটা বাঁশির শব্দ তার কানে এলো। সেটা কিসের শব্দ তা দেখবার সময় তার আর নেই, বোধ হয় পুলিস এসে পড়েছে।

একরকম ছুটেই সে চলতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সে এসে পড়লো একটা লোকালয়ে। প্রথম খানকতক বাড়ি বাদ দিয়ে সে একটা বড়গোছের বাগানওয়ালা বাড়ি দেখে দরজায় আঘাত করলো।

মনে ভাবলো এই হলো নিরাপদ স্থান। প্রমাণ না পেলে পুলিস এখানে হামলা করবে না।

কিছুক্ষণ আঘাতের পর একজন এসে দরজা খুলে দিল। ভেতরের স্তিমিত আলোকে তার মুখখানা ভাল দেখা গেল না। কিন্তু গায়ের কাপড় থেকে মনে হলো গেরুয়া রঙ।

নিজের গল্প বলে পুলিন বলে—আমি একজন সন্ন্যাসী। কাল থেকে অভুক্ত আছি। বাইরে বড় ঠাণ্ডা, এখন একটু আশ্রয় চাই। রাত ভোর হয়ে গেলেই আমি চলে যাব এখান থেকে। একটু আশ্রয় পাব কি ?

—আশ্রয় ? ভেতরের লোকটি বললো। আশ্রমে এসে সন্ন্যাসী আশ্রয় পাবেন না ! তা কখনও হতে পারে ? আপনি আসুন, বিশ্রাম করুন।

ছেলেটি পুলিনকে সঙ্গে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে আসে।

পুলিন ভাবে হয়েছে ভাল। তেমন বুঝলে এখানেই দু'একদিন আত্মগোপন করা যাবে। তারপর সুবিধেমত এখান থেকে গেলেই হবে।

একটি ঘর দেখিয়ে লোকটি বললো—আপনি আসুন মহারাজ ! এইখানে বিশ্রাম করুন। সকালে এই মঠের অধ্যক্ষার সঙ্গে দেখা হবে। অল্পই রাত আছে। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন।

পুলিন দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে একটা তক্তাপোশের ওপর শুয়ে পড়ে বলে—আঃ !

কলকাতা ছাড়বার পর থেকে সে এতখানি আরাম বোধ হয় আর ভোগ করেনি। টানা ট্রেনে করে যেতেও সে সাহস করেনি। অনেক জায়গায় তাকে নামতে হয়েছে। খুব সতর্কে তাকে পা ফেলতে হচ্ছে। একটা পা তার ভুল ফেলা হয়ে গেলেই তাকে

ধরা পড়তে হবে। গুপ্তচরবৃত্তির জন্য তার শাস্তি হতে পারে। তাছাড়া সব চাইতে বড় কথা, তার পার্টির বিরুদ্ধে সরকারের কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পৌঁছুবে—তার মানে তার পার্টি আর কোনদিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তাই চলবার সময় পেছনের প্রতিটি পায়ের ছাপ তাকে মুছে দিয়ে যেতে হচ্ছে।

ক্লান্তিতে সে বোধ হয় খানিকটা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙলো রাত্তিরে দেখা সেই সন্ন্যাসীরই ডাকে।

সে বলে—উঠুন মহারাজ, মাতাজী আপনাকে ডাকছেন। আপনি ক্ষুধার্ত জেনে আপনার খাবার নিয়ে বসে আছেন তিনি।

পুলিন বলে—মাতাজী কে?

সন্ন্যাসী বলেন—তিনি ঠিক যে কে তা আমরা জানি না। তবে এই পর্যন্ত জানি, স্বামী শিবানন্দ, যিনি এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই তাঁকে কোথা থেকে এনেছিলেন। তাঁর মন্ত্রশিষ্যা তিনি। মৃত্যুসময়ে স্বামী শিবানন্দ এই মঠের গদিতে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনিই এই সংঘের নেত্রী।

পুলিনের মনে হলো খালি ছেলের দলই নয়, মেয়ের দলও তাহলে সঙ সাজে।

মুখ হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে পুলিন গেল সংঘনেত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। ভাবলো মেয়েছেলে তো, দু'একটা কথায় তাকে ভেজাতে পারলে চাই কি এখানে দু'একদিন বিশ্রাম করাও যেতে পারে। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় যায়!

সেই লোকটির কাছ থেকেই পুলিন জেনে নেয় মাতাজীর নাম প্রব্রাজিকা শক্তিপ্রাণা। লোকে তাঁকে "দুর্গা মা" বলে জানে।

নাম শুনে পুলিনের হাসি পায়, কিন্তু হাসবার উপায় নেই। ভাবে টাকা রোজগার করবার মন্দ ফিকির নয়।

এই সব ভাবতে ভাবতে পুলিন সংঘনেত্রীর ঘরের দিকে এগোতে থাকে।

ভেবেছিল, ঘরের মধ্যে ঢুকে সে একজন বৃদ্ধাকেই দেখতে পাবে। ঘরের মধ্যে বৃদ্ধার পরিবর্তে এক যুবতীকে দেখে সে চমকে উঠলো। গেরুয়ারঙের একখানা শাড়ি পরা, মস্তক মুণ্ডিত। গায়ের রঙ সাদা। তার ওপর একটা গেরুয়ারঙের চাদর দিয়ে সমস্ত গা-টা ঢাকা।

সঙ্গের লোকটি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে বললো—মাতাজী, আমাদের অতিথি এসেছেন।

—বসতে দাও ওঁকে। এই খাবারটা ওনাকে দাও, আগে খেয়ে নিন, পরে কথা হবে।

মাতাজীর মুখ ফেরানো ছিল। তাই পুলিন দেখতে পেল না। কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনে যেন তার মনে হলো, এ স্বর সে কোথায় শুনেছে!

মুখে তার খাবার উঠছিল না। সামান্য কিছু খেয়েই সে চায়ের কাপ মুখে তুলে ধরে।

পেছন থেকে দেখে পুলিন বুঝতে পারে, মাতাজী তখন ফল কাটছেন। বোধ হয় বিগ্রহের সেবার জন্যে।

চা খেয়ে অনেকখানি সুস্থ বোধ করে পুলিন। কিন্তু তার বুকের স্পন্দন ক্রমশঃই বেড়ে যায়, কে এই মাতাজী জানবার জন্যে।

পুলিনের সঙ্গের লোকটিকে মাতাজী বলেন—মুকুন্দ মহারাজ, আপনি এই ঠাকুরের ভোগগুলো নিয়ে মন্দিরে যান। পূজা আরম্ভ করুন। আমি যাচ্ছি একটু পরে মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে।

মাতাজীর আদেশমত ফলের থালাটা হাতে তুলে নিয়ে মুকুন্দ মহারাজ চলে যান।

ফলের খোসাগুলোকে সরিয়ে দিতে দিতে মাতাজী বলেন—আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম মহারাজ! কিছু মনে করবেন না। কাজের কি শেষ আছে!—বলতে বলতে মাতাজী মুখ ফেরালেন।

পুলিন, মাতাজী দুজনেই স্তম্ভিত।

বিস্মিত পুলিনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—তুমি, তুমি শর্মিলা—এখানে?

শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে শর্মিলা জবাব দেয়—হ্যাঁ। চিনতে পেরেছ তাহলে?

পুলিন বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে উঠে বলে—তুমি আজ সন্ন্যাসিনী! কি কারণে?

জবাবে শর্মিলা বলে—তোমারই জন্যে!

পুলিন আরও বিস্মিত হয়ে গিয়ে বলে—তার মানে?

হেসে শর্মিলা জবাবে বলে—আমরা ভারতবাসী, হিন্দু, বাঙালী। ছেলেবয়েস থেকেই আমরা সীতা, সাবিত্রীর গল্প শুনে এসেছি।

পুলিন বলে—সেসব গল্প তো পৌরাণিক গল্প। তা তো সত্যি নয়। তোমার মত ইংরেজী শিক্ষিতা মেয়ে সেসব গল্প কেন বিশ্বাস করবে?

শর্মিলা বলে—বিশ্বাস করতাম না যদি না তার মধ্যে থাকতো ভারতবর্ষের আত্মার চিরন্তন সত্যবাণী। সেই বাণী এই গল্পগুলোর মধ্যে আছে বলেই এইসব কাহিনী আমি বিশ্বাস করেছি।

পুলিন প্রশ্ন করে—সে কাহিনী কি?

—সে কাহিনী একনিষ্ঠতা। তাকেই আমরা বলি সতীত্ব। সতীত্বের এমন অপূর্ব কাহিনী আর অন্য কোন দেশে আছে বলে শুনেছ পুলিন? এমন প্রেম, এমন ভালবাসা যে দেশের শিক্ষার

রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে, তাকে কি আমি ভুল মনে করতে পারি ?

পুলিন বলে—কেন তুমি এ পথ নিলে ? তুমি তো বিয়ে করে, বড়লোকের স্ত্রী হয়ে আজ সুখী হতে পারতে।

শর্মিলা জবাবে বলে—আধুনিক কালের বিদেশীভাবাপন্ন মেয়ের কাছ থেকে সেইটাই তোমরা আশা করতে পারতে। কিন্তু আমি ভিন্ন ধাতুতে গড়া।

ছেলেবয়সে, মা যখন ভাল থাকতেন, তখন এই ধরনের সতীত্বের গল্প বলতেন। তা শুনতে শুনতে আমার মন এক অপূর্ব আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠতো। ভাবতাম, আমি কবে এঁদের মত পরীক্ষা দিতে পারব ?

খেলার ছলে তোমার হাতে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিলাম। সেকথা বুঝলাম বড় দেরিতে। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না।

শর্মিলা থামলো।

পুলিন প্রশ্ন করে—তারপর শর্মিলা—তারপর ?

—তোমাকে বিয়ে করতে বললাম। বুঝলাম তুমি বিয়ে করতে চাও না। চাও একজন শয্যাসঙ্গিনী। কারণ সে রাত্রে—

পুলিন বলে—আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার দাদা আমায় অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সে দোষ আমার নয়।

একটু যেন বিদ্রূপের সুরেই শর্মিলা বলে—তোমার অহংকারে লেগেছিল। কিন্তু একবারও ভেবেছিলে কী, তুমি যাকে পেছনে ফেলে আসছো, তার উপায়টা কি হবে ? কি নিয়ে সে বাঁচবে ? দীর্ঘ দুটো বছর তোমার জন্যে অপেক্ষা করলাম, কিন্তু তোমার কাছ থেকে কোন ডাক পেলাম না। তুমি তখন ঘুরছো প্রতিশোধের উন্মাদনায়।

পুলিন বলে—আমি কি করে ডাক দেব তোমায়? তোমরা বড়লোক। তোমাদের বাড়িতে গেলে ফের যদি অপমানিত হই!

শর্মিলা বলে—উত্তেজিত হয়ো না পুলিন! তোমায় আমি অভিযুক্ত করিনি। আমাকে ভুলে তুমি যদি না যেতে, কিংবা আমার আকর্ষণ তোমার জীবনে থাকতো তাহলে তুমি জানতে পারতে তোমাকে আমি কতখানি ভালবাসতাম।

কিন্তু তুমি আমাকে বোঝবার চেষ্টাও করলে না। ভাবলাম এখন আমার উপায় হবে কি? দাদা, বাবা বিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু বিয়ে তো আমি আর করতে পারি না! আমার যুক্তি তাঁদের বোঝালে কেউ বুঝবেন না। তাঁরা বলবেন সামাজিক অনুষ্ঠান তো হয়নি! দেখ পুলিন, আমাদের দেশে গান্ধর্ব বিয়ে বলে একটা বিয়ে আছে। তাকে হিন্দুসমাজ অস্বীকার করেনি কোন দিন। তাই ওঁদের বাড়ি ছেড়েই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হলো। আমি বড়লোকের মেয়ে হতে পারি, কিন্তু গরিবের স্ত্রী।

পুলিন আবেগের স্বরে বললো—সে রাত্রে তুমি আমার কাছে গেলে না কেন?

—যদি তুমি আমাকে আশ্রয় না দাও? বড়লোকের মেয়ের একটা ধাপ্পাবাজি বলে মনে কর? তখন? আমি সব সহ্য করতে পারতুম পুলিন, সহ্য করতে পারতুম না কেবল আমার ভালবাসার অপমান। এ বড় পবিত্র, বড় মহৎ। আমাকে আশ্রয় দিলেন এই মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ। তিনিই আমাকে সে রাত্রে হাওড়া স্টেশনে চিনতে পারেন। তাঁর মুখেই শুনলাম, আমাদের দেশের আদর্শ, পশ্চিমের ভোগবাদ নয়। পূর্বের আদর্শ ত্যাগ। আমরা স্বামী গ্রহণ করি, সেই পরম স্বামী নারায়ণকে লাভ করবো বলে। তাই স্ত্রীলোকের কাছে স্বামী দেবতার চেয়েও পবিত্র। স্বামী গুরুর চেয়েও বড়। স্বামী ইহকাল পরকাল। তাই তোমাকে

অবলম্বন করে আমি পৌঁছুবার চেষ্টা করছি সেই সকলের আরাধ্য ভগবানে।

শর্মিলা চুপ করলো। পুলিন ভাবে এ আবার কেমন নতুন কথা? রূপ, যৌবন, অর্থ, ভোগের জন্য এ পৃথিবীতে যা কিছু প্রয়োজন তা সবকিছু মুঠোর মধ্যে পেয়েও তাকে এমনভাবে কেউ ছেড়ে দেয়?

পুলিনের মুখে কথা যোগায় না। তার মনে পড়ে রেণুকে। বুকের মাঝখানে জড়িয়ে ধরে উত্তপ্ত মুখে চুম্বন দিতে দিতে সে বহুবার বলেছিল—ভালবাসি। তাই সে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এমন আনন্দ তো তাতে পায়নি! যৌন উত্তেজনা কমবার পরেই রেণুর সঙ্গ তার কাছে আনন্দদায়ক হয়নি তো! তাই রেণু বাইরে গেলে, লুকিয়ে অন্য নারীর সঙ্গ করতেও সে পিছপা হয়নি।

রেণুও তাকে যখন ফেলে গেছে, তখন তাকে পরিষ্কার বলে গেছে—তার জীবনে পুলিনের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। তারই সামনে অন্য পুরুষকে নিয়ে তারই জায়গায় সে অভিষেক করেছে। কিন্তু শর্মিলা? সে তো সব পেয়েও তাঁরই জন্যে সব ছেড়েছে! একে তো বলা যায় না বুর্জোয়ার মনোবৃত্তি! এরা তবে কি? এ কি জড়? কিন্তু জড় হলে, জীবনের পথে একা চলা, একটা আশ্রমের ভার নেওয়া তো সম্ভব নয়! এ কি প্রাণের স্পন্দন? অদ্ভুত অদ্ভুত! একটা নতুন সত্যের যেন সম্মুখীন হলো পুলিন! জীবনের এই পরম পবিত্র দিকটা তো তার দেখা ছিল না!

শর্মিলা বলে—নিজের কথাই বলে গেলাম। তোমার কথা শোনা হলো না তো। এই সন্ন্যাসীর ভেক ধরলে কবে থেকে? কি মতলব বল তো? কলকাতা ছেড়ে এখানেই বা কেন? আসাম অঞ্চলে?

পুলিনের মনে হয়, এই নারীর কাছে সব স্বীকার করে। বলে—শর্মিলা! আমাকে তুমি বাঁচাও। পরমুহূর্তে তার মনে হয়, তাতে পুলিস তাকে ছাড়বে না। তাছাড়া, ভারতবর্ষের মুক্তিও আসবে না। যে করে হোক এই ফাইলটা ওই মুক্তি সেনার হাতে তাকে পৌঁছে দিতেই হবে। তার আগে তার উদ্দেশ্যের কথা বলা চলবে না। তাই পুলিন বলে—কলকাতা ভাল লাগলো না। সংসারেও আর আস্থা নেই। বেরিয়ে পড়লাম শান্তির সন্ধানে। সেইজন্যে এই গেরুয়া বসন। একে ভেকও বলতে পার, আবার সাধনার প্রথম সোপানও বলতে পার।

শর্মিলার মুখে একটা বিচিত্র হাসি খেলে গেল। সে বলে—চিরকাল লোক ঠকিয়ে ঠকিয়ে মনে করেছ কি নিজেকেও ঠকাতে পারবে? না, আমার চোখেও ধুলো দিতে পারবে? আমি তোমাকে জানি ভালোরকম। এখনও বল তোমার আসল উদ্দেশ্য কি।

পুলিন বলে—প্রভুর নাম করে বেড়াব, এতে যদি সন্দেহ কর তো কর! তাতে তো আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু, আপসোস যে তুমি আমাকে বিশ্বাস করলে না। আমার প্রাপ্য কেবল অবিশ্বাস, যেহেতু আমি গরিব।

শর্মিলা বলে—দেখ পুলিন, এতে গরিব-বড়লোকের প্রশ্ন নেই। আর ও কথা বলে আমাকে উত্তেজিতও করতে পারবে না। কারণ, সংসারে আমার কোন আকাঙ্ক্ষাই নেই। তবে তুমি যে সন্ন্যাসী নও, তার প্রথম প্রমাণ, তোমার মাথার ওই চুল। সন্ন্যাসীই যদি তুমি হতে, তোমার মাথা হতো কেশহীন নয়তো জটায় ভরা। তাছাড়া, দিন পনের আগে তুমি শ্রীরামপুর অঞ্চলে গিয়েছিলে বক্তৃতা করতে। তোমার সেই বক্তৃতা লোকে শোনেনি। পনের দিনের মধ্যে, আশা করি, তোমার মনের এমন কিছু পরিবর্তন হয়নি! একটা বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে তুমি নিশ্চয়ই এদিকে এসেছ।

পুলিন বোঝে যে, এর পর মিথ্যা কথা বলা মূর্খতা। তাই পুলিন বলে—ভগবানকে আমি বিশ্বাস করি না। মুক্তিফৌজ এগিয়ে আসছে। দেশের লোকের কল্যাণের জন্যে আমি ওদের সঙ্গেই হাত মেলাবো। চিরদিনের মত দেশ থেকে আমি বড়লোকদের উচ্ছেদ করবো।

শর্মিলা যেন শিউরে উঠলো পুলিনের ওই কথা শুনে। সে বলে—দেশের কল্যাণ করবে আবার এক বিদেশীকে ডেকে এনে? সামান্য ক'টা টাকা আর একটুকরো রুটির মোহে নিজের মাকে তুলে দিয়ে আসবে বিদেশীর হাতে ভোগের জন্যে? আর তুমি কি মনে কর, রুপো যারা দেবে, তারা বিনা ভোগে ছেড়ে দেবে তোমাদের মাকে!

পুলিন বলে—এ হলো ভারতের কোটি কোটি শ্রমিকের মুক্তির কথা—ভাবাবেগের স্থান নেই এখানে।

শর্মিলা বলে—দেখ পুলিন, কার্ল মার্কস তোমাদের এই নীতি প্রবর্তন করেছেন। তাঁকেও এ চিন্তার আবিষ্কর্তা বলতে পারি না। তার বহু আগেই ইওরোপে সক্রেটিস, প্লেটোর মনে এ চিন্তা এসেছিল। কিন্তু বলতে পার, কেন কার্ল মার্কস এই নীতি প্রবর্তন করেছিলেন?

পুলিন বলে—শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য।

শর্মিলা বলে—না। জাতিতে তিনি ছিলেন জু। একবার খ্রীষ্টান হয়ে পরে ধর্মত্যাগও করেন। ইহুদী জাতিসুলভ মনোভাব তাঁর মন থেকে দূর হয়নি। ধনিকদের হাতে এই জুয়েরা হতেন অত্যাচারিত। মনে মনে তিনি চেয়েছিলেন এর প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু তিনি শক্তিহীন। নিঃসন্দেহভাবে তিনি ছিলেন প্রতিভাবান্। তিনি বুঝলেন, শ্রমিকদের যদি তিনি ক্ষেপিয়ে তুলতে পারেন, তাহলে তারাই তাঁর হয়ে ওই ধনীদের ওপর প্রতিশোধ নেবে।

হেগেলের দর্শনের তিনি নতুন রূপ দিলেন। শ্রমিকদের মনে তিনি জাগালেন ঈর্ষা। ঈর্ষাতেই এর জন্ম, আর ঈর্ষায় এ বর্ধিত হলো। শ্রমিকদের মালিকদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে কার্ল মার্কস নিজে এক নিঃসন্তান মিলমালিক এঞ্জেলর দাক্ষিণ্যে তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। আর এঞ্জেলর সম্পত্তি তোমাদের মতে নিশ্চয়ই শ্রমিক-ঠকানো অর্থে উপার্জিত। অথচ বেঁচে থেকে মার্কস এঞ্জেলর দান ঘৃণ্য বলে ত্যাগ করেননি। এই তো নীতিবিদ এঁরা! আদর্শ তাঁর কোথায় রইল তাহলে?

পুলিন কি উত্তর দেবে এর? এর জন্য তো সে প্রস্তুত ছিল না! সে ভাবতেই পারেনি ওই বড়লোকের দুলালী এত পড়েছে!

শর্মিলা বলে—জানি, জবাব দেবার মত তোমার কিছু নেই। তোমাকে বললেও তুমি শুনবে না। তবু বলি—দেশের কল্যাণ এ পথে হবে না। কারণ, ও দেশের আদর্শর সঙ্গে এ দেশের আদর্শ মিলবে না। ওদের আদর্শের জন্ম হয়েছে ভোগের পথে, এদের আদর্শের জন্ম হয়েছে ত্যাগের পথে। এ দেশের লোক প্রতিদিন মানুষের মধ্যে দেখেছে ভগবানের প্রকাশ! তাই ও চিন্তাধারার এখানে প্রয়োজনও নেই। তাছাড়া, তুমি যে কোটি কোটি শ্রমিকের কথা বলছ, একবার কি নিজে তাদের মাঝে গিয়ে দেখেছ তারা কি চায়? শুনেছ কি তাদের অন্তরের বাণী? স্বামী বিবেকানন্দের মত দেশকে বুঝবো বলে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছ কি সারা দেশ? দূর থেকে ভারতের দিকে চেয়ে একবারও কি ধ্যানে ডুবে গেছ এ দেশের কল্যাণে? বিলাসের শয্যা ফেলে একবারও কি তাদের দুঃখে কেঁদেছ? দেখেছ কি ভেবেছো কি ভারতের প্রাণস্রোত যুগ যুগ ধরে কোন্ পথে প্রবাহিত হচ্ছে? তা যখন দেখিনি, তা যখন বোঝনি, তখন তোমার চিন্তা, তোমার কথার দাম কি? গোটাকতক ধারকরা বিদেশীয় সস্তার কথা বলে লোকের মনে সাময়িক উত্তেজনা

আর হিংসার সৃষ্টি করতে পার, ঘরবাড়ি ভাঙতে পার, কিন্তু গড়তে পারবে না। তাছাড়া, যে বিদেশী শত্রুকে তোমরা ডেকে আনতে যাচ্ছ, তাদের দেশেই দেখা দিয়েছে গত তিন বছর ধরে দুর্ভিক্ষ! তাদের দেশের লোকই খেপে গিয়ে বলছে "রুটি চাই!" ওদের দেশের সরকার দেখলে, এখন তাদের গদি যায়, তাই তারা তাদের লেলিয়ে দিলে তোমাদের ওপর। দেখ, চীনা মেয়েরা এলো নেফাতে গুপ্তচরের কাজে। তারা স্ত্রী হলো, মা হলো, কিন্তু তাদের সেইসব স্বামীদের দেশের গুপ্তকথা জানিয়ে দিল স্বদেশবাসীকে। নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ সতীত্ব বিকালো পণ্যদ্রব্যের মত রাজনৈতিক কারণে। যে দেশে স্বদেশবাসী নারীর মুল্য নেই, সে জাতকে সুসভ্য বল? দেখ, নারীকে অপমান করেছিল বলে মহাভারতের কৌরবকুল ধ্বংস হয়ে গেল। নারী নির্যাতিত হয়েছিল বলে ভারতবর্ষের আবার হলো পতন। সেইজন্যই তো এ যুগের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ নারীকে নিলেন গুরু করে। বঙ্কিম লিখলেন "আনন্দমঠ"। শান্তির মত চরিত্র সৃষ্টি করে দিলেন মাতৃমন্ত্র—"বন্দে মাতরম্"। স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ হলো শুরু। পুলিন! সেই সোনার দেশকে তুমি পরের কাছে বিকিয়ে দিও না।

একবার মীরজাফরের দল দেশকে বিদেশীর হাতে তুলে দেওয়ার ফলে কি ক্ষতি হয়েছে তা চোখে পড়ে না কি!

মীরজাফরের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যে একটা অমূল্য লাভ তা কি তোমরা স্বীকার কর না?

একলা মীরজাফর কি ক্ষতি করতে পারে পুলিন যদি তোমরা তাকে সাহায্য না করতে? অথচ ওই মুষ্টিমেয় ইংরেজ পুঙ্গব দু'শ বছর ধরে ভারতকে শোষণ করে তাকে আজ অস্থিচর্মসার করে চলে গেছে। যেত না যদি তাদের দেশে লোকবল থাকতো। কিন্তু

অগুনতি মানুষে ভরতি চীনের হাতে আজ এদেশ তুলে দিলে এর স্বাধীনতা আর কি কোন দিন ফিরে পাবে ?

পুলিন বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

—তাছাড়া তোমরা কি করেছ, জান ? তোমাদের প্ররোচনায় দেশের সংকটের সময় রাজপথে একদল তরলমতি যুবক গেয়ে বেড়াচ্ছে—

"যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই,
চীনের সঙ্গে মৈত্রী চাই,
শত্রু-মিত্র আমরা ভাই
যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই।"

এ কি শান্তি, না পরাধীনতার শৃঙ্খল ?

পুলিন বলে—তুমি স্ত্রীলোক, তোমার সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা করাই ভুল। তাছাড়া, কে জানে, এই দলের সঙ্গে নেতাজী আসছেন কিনা !

শর্মিলার চোখে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। ঠোঁটদুটো কাঁপতে থাকে। সে জবাবে তখন বলে—চমৎকার পুলিন ! ওই নেতাজীকেই একদিন না তোমরা বিশ্বাসঘাতক বলেছিলে ? আজ আবার তাঁরই পবিত্র নাম ভাঙিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চাও ? নেতাজী এলে এভাবে চোরের মতন কখনই আসবেন না।

পুলিন বিরক্ত হয়ে বলে—আমার বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।

ঠিক সেই সময় আশ্রমের দু'চারজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ছুটে এসে খবর দেন মাতাজীকে। পুলিস আশ্রম ঘিরে ফেলেছে। ওরা বলছে, কাল রাতে নাকি একজন গুপ্তচর এখানে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা বলেছি যে তেমন সন্দেহজনক কেউই আসেনি। তবে একজন

সন্ন্যাসী কাল রাতে এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। ওরা তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে চায়। মন্দিরের ওখানে অপেক্ষা করছেন ইন্‌স্পেক্টর সাহেব। তাঁকে কি এখানে নিয়ে আসবো?

শর্মিলা বলে—তাঁকে নিয়েই এস এখানে।

তারা চলে যেতেই পুলিন ভয়ার্তকণ্ঠে বলে ওঠে—শর্মিলা, তুমি আমাকে বাঁচাও!

শর্মিলা বলে—না, কৃতকর্মের শাস্তি তোমাকে নিতেই হবে। তুমি নিঃসন্দেহে থাক, আমি তোমাকে ধরিয়ে দেব না। তবে ওরা যদি তোমায় চিনে ধরে, তবে বাধাও দেব না।

পুলিন একটু ব্যঙ্গের সুরে বলে—তা দেবে কেন? তুমি যে সন্ন্যাসিনী! তুমি যে বড়লোকের মেয়ে!

পুলিনের এই আঘাতে শর্মিলার চোখে জল আসে। সে কথার জবাব দেয় না।

ঠিক এমনি সময় ঘরের মধ্যে এসে ঢোকেন পুলিস ইন্‌স্পেক্টর। সসম্ভ্রমে তিনি বলেন—মাতাজী! পরমুহূর্তে পুলিনের চোখে চোখ পড়তেই বলেন—আরে! মিঃ বোস না! আরে একেবারে গেরুয়া! চেনবার উপায় নেই যে! ছিলেন নাস্তিক, প্রয়োজনের খাতিরে একেবারে রং বদলিয়ে আস্তিকের চরম! চলুন। আজ তিন দিন ধরে বড়ই ভুগিয়েছেন। সাধনার ব্যাঘাত হয়েছে প্রচুর। এখন কিছুদিন নির্জনে সাধনা করার দরকার।

পুলিন কোন কথাই বলতে পারে না। মুখ তার কালো হয়ে যায়।

ইন্‌স্পেক্টর বলেন—মাতাজীকে আর বিরক্ত করে লাভ নেই। চলুন, উঠুন।

পুলিন মাথা নীচু করে পুলিস অফিসারের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় শর্মিলার দিকে চেয়ে বলে গেল—

তোমার গেরুয়ার আড়ালে যা আছে, তা বোঝা গেল। সব মিথ্যে, সব ভুয়া !

শর্মিলা কোন কথাই বলে না। চোখের জলে তার বুকের চাদরখানা শুধু ভিজতে থাকে। সন্ন্যাসিনী হলেও সে তো মানুষ !

—শেষ—